শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

কাব্যসংগ্রহ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
কাব্যসংগ্রহ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
কাব্যসংগ্রহ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

আমার প্রিয় বান্ধব মতি নন্দী-কে

আমাদের প্রকাশিত কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো
পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি
চতুর্দশপদী কবিতা
ঈশ্বর থাকেন জলে
গালিবের কবিতা (আয়ান রসিদের সঙ্গে)
ওমর খৈয়ামের রুবাঈ
মেঘদূত

এই সব পত্ত

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কশ্চিৎ গণ্ডগ্রাম এই বহড়ু, ডাকনাম বড়ু। লোকে শুধুলে বলি, জয়নগর-মজিলপুরের নাম জানেন ? ঐ যে, যেখানে মোয়া। কলকাতার লোক সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাৎ করে। তৎক্ষণাৎ তার আগের ইষ্টিশানের গল্প বলি অর্থাৎ ঐ বড়ুর গল্প।

দাদামশাই-এর পুরনো বাড়ি ছিলো ভুঞ্জবাবুদের বড়োবাড়ির গায়ে। তাঁদের দুর্গামণ্ডপ ছিলো। তাঁদের বিরোৎ বিরোৎ বাগান আর পুকুর ছিলো। তাঁদের গোটের মধ্যে কাছারিবাড়ির লাগোয়া বাগানে ফুলগাছ ছিলো বিস্তর। আমরা সেখানে বাতাবিলেবুর বল খেলতে যেতুম। গোটের সামনে আমলকিতলা ছিলো, তার পেছনে ছিলো ইটখোলা। মনে পড়ে, কোন্ একটা পুকুরের মাছ, মাথাসার—গায়ে কোনো গত্তি থাকতো না। গাঁয়ের মানুষ সে-মাছ দেখে ভয় পেতো। ভূত-লাগা সেই পুকুরের মাছ, জালে উঠলে, আমরা ছোটরা সব হুমড়ি খেয়ে পড়তুম।

ওটা ছিলো দাদামশাইদের শরিকি বাড়ি। আমার জন্ম ঐ বাড়িরই সার্বজনীন আঁতুড়ঘরে কোনো। একদিন দেখলুম, ওঁরা রাতারাতি এ-ঢিবি ও-ঢিবির দখল নিলেন—ছাঁদতলা দিয়ে মাটি ভাগ হতে থাকলো, দুঘরা মাটির বাড়ির মাঝখানে বেড়া উঠলো বাঁশকাঠির, তার তল চেপে এক বিঘৎ করে রাঙচিতা আর মেন্দি ঝোপ। একান্নবর্তী পরিবার ফেটে চৌচির হয়ে গেল, আমার নিজস্ব দাদামশাই একদিন বড়ুর ইষ্টিশানের কোলের কাছের বাড়িতে উঠে এলেন। মন-মন কাজে এ-বাড়ি তিনি যে কবে তৈরি করতে শুরু করেছিলেন, কেউ জানতো না। ধানী জমি, মাটি ফেলে উঁচু আর বাসযোগ্য করে তাঁর বাড়ি উঠলো। রেল কোম্পানির জমির ঠিক গায়েই। হলুদে-শাদায় মেশা 'মৃণালিনী কুটির'—দিদিমার নামে। যতদূর মনে পড়ে দাদামশাই-এর হাতে এর নামকরণ হয়নি, হয়েছে পরবর্তীকালে কোনো, তাঁর পুত্রদের হাতে—মাতৃস্মৃতি জাগ্রত রাখার জন্য। দিদিমা কলেরায় মরেছিলেন

কলকাতার বাসাবাড়িতে—মামাদের তিনতলার ঘরে। আমাদের চোখের ওপর সাপটে পেরেক পোঁতা হলো। আমরা কেউ একা তিনতলায় উঠতাম না—বিশেষত ঠিক দুক্কুরবেলায়!

গাঁয়ের ছেলে হলেও মনে ভয় ছিল পুরোদস্তর। চোর ছ্যাঁচোড় ডাকাত আর ভূতের ভয়। আর একটা ভয় পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় ডুবে থাকতো—সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে গেলেই ডোবাবে—যদি পা লাগে ডুবো মন্দিরের চূড়োয়। সব প্রতিষ্ঠিত পুকুরের মাঝখান বরাবর একটা পাতালপুরীর মন্দিরের কথা বিশ্বাস করতে কে বা কারা যেন আমাদের ছোটবেলায় শিখিয়েছিলো।

বাবা মারা গেলেন যখন আমার নামমাত্র বয়েস, তারপর থেকেই মামাবাড়ির গলগ্রহ—মা আর ছোটভাই মামার সংসারে...কলকাতায়। আর আমাকে দাদু রেখে দিলেন তাঁর কাছে একাকী, মানুষ করবার জন্যে। সে-বাড়িতে মানুষ ছিলো তিনজনই। দাদু আমি আর আমার এক বালবিধবা মাসি। বিশাল বাড়ি, দু দুটো অন্ধকার বাগান, দুটো পুকুর, আটটা পুকুরপাড়, পাড় ভর্তি মাছরাঙার গর্ত, গোয়াল ভর্তি গাই-বাছুর—এইসব। গোয়াল আর বাগানের কাজ দেখতো ওতোর-পাড়ার হৈদরদা। দাদু করতেন হোমিও ডাক্তারি, আমি অ্যাপ্রেনটিস কম্পাউণ্ডার। বিনি পয়সার ডাক্তার, তবে একডাকে দশটা গাঁয়ের লোক চিনতো। পেরনাম জানাতো। অমন সদাশয় মানুষ, যেমন মন তেমন দেহ, অমন রূপবান বৃদ্ধ আমি জীবনে খুবই অল্প দেখেছি। ইস্কুল মাস্টারি? হ্যাঁ, তাও করেছেন—আসলে ইস্কুল গড়তেই হাত লাগিয়েছেন বেশি করে। কাছা খুলে দান করেছেন—যতটুকু ছিলো, তাঁর মৃত্যুর পরে শুনেছি, ধার করেও দান করেছেন অনেক অনেককে।

দাদুর গায়ে এক ধরনের চন্দনের গন্ধ ছিলো—ভোরবেলাকার পুজো থেকেই লেগে থাকতো তা। দিনরাত্তির সব সময়েই এই সৌরভ তাঁকে ঘিরে থাকতো সুসংবাদের মতন। স্ত্রী গেলেন, একটি দুটি মেয়ের বর বাদে চার চারটি মেয়ের কপাল পুড়লো। তখনো তিনি সেই চিরন্তন সন্ন্যাসী, অপরকে নিয়ে ব্যস্ত, সসুখী—অসুস্থকে নিয়ে উন্মাদ—সন্ন্যাসীর মতন স্বার্থ নিয়েও নয়।

তিনি আমাকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ করে তুলবার জন্যে তাঁর

কাছে রেখেছিলেন, আর আমি যাচ্ছিলাম ক্রমাগতই বেঁকেচুরে। আমার হওয়া হয়নি, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া হয়নি কিছুই। এক ঐ উদাসীনতা ছাড়া।

সারাজীবনটাই মনে হয়, খুব একা ছিলেন তিনি। আমিও অজ্ঞাতে ঐ একা থাকার দীক্ষা নিয়ে থাকতে পারি। বাবার কথা তেমন বিশেষ মনে পড়ে না—শুধু যেখানে ঐ বড়ুর বিশ্বজাঙ্গালে তাঁকে পুড়িয়ে এসেছিলো এক শিশু—সেখানে গেলে তার পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমি পার হতে পারিনি কোনোদিন। চোখকান বুজে ঐ আধ মাইল রাস্তা আমাকে দৌড়ে যেতে হতো। কী জানি কেন? প্রিয়জনে তো ভয় থাকার কথা না, তবু ভয় হতো। মনে হতো, তিনি আমায় খপ্ করে ধরে ফেলবেন। ধরেই কিছু নাছোড়বান্দা কথা—তাহলে? আমি মরে যাবো।

আজো মনে হয়, তাঁকে আমি চিনতে না পারলেও তিনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। সঙ্গে আছেন। আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করছেন। তাঁকে ভালোবাসি না, ভালোবাসার সময়ই পাইনি। তাঁকে ভয় করি। আজো বিপদে পড়লে তাঁকে ডাকি। মনে হয়, তিনি তাঁর দুর্দান্ত কালো মুখচোখ নিয়ে আমার সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন। স্পষ্ট দেখতে পাই, তিনি আমায় বাঁচিয়ে রাখছেন। নয়তো কবেই আমার মরে ভূত হয়ে যাবার কথা।

ছোটবেলায় ঐ ইষ্টিশান, দোলমঞ্চ, গাঁয়ের চাষাভূষোর সঙ্গে গাছপালা, পানাপুকুর—পরিপ্রেক্ষিতসুদ্ধু এক পাড়া-গাঁ আমার মধ্যে চেপে বসেছে। তার থেকে পরিত্রাণ কখনো পাইনি।

ছোটবেলায় একদিন রেললাইন ধরে ঝুলন্ত চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়েছি—যেদিকে পেরেছি গেছি। সেই চাঁদ আর ছাদের ওপর সপ্ বিছিয়ে রবিঠাকুরের গান শোনাতো পরবর্তীকালে মাসির মেয়েরা —তখন দাদু নেই, অথচ আমি তাঁর বাড়িতে আছি, সঙ্গে দাঙ্গালাগা এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছে কলকাতার মাসি, তাঁর ছেলেমেয়েরা— তখন ধীরে ধীরে যেন সামাজিক রান্নাবান্নার ভেতর থেকে মানুষের মতন এক সম্পর্ক দানা বাঁধছে। ঐ প্রথম কলকাতার স্পর্শ পাচ্ছি। আমার গ্রাম থেকে তখনো অনেক রেলগাড়ি কলকাতা শহর ছুঁয়ে চু কিৎ কিৎ

খেলছে। ক্বচিৎ কখনো সেখানে গেছি দাদুর হাত ধরে। শিয়ালদা থেকে সটান ঘোড়ার গাড়ি। সেখানে ঘোড়ার গুয়ের গন্ধে আমার শহরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এখনো ফিটন দেখলে পা থমকে যায়। সহিসের সঙ্গে দু চারটে বাক্যালাপ করি। সহসা তাকিয়ে দেখি, সেদিনের মতন একটা রাস্তা যেন জলপ্রপাত, তার গা থেকে গাড়িঘোড়া সব হুড়মুড় করে ধারাবাহিক গড়িয়ে পড়ছে। নিচে গভীর খাদ। হাঁ করে আছে কলকাতা শহর। তার ক্ষিদে সাংঘাতিক।

এই কলকাতা যখন আমাকে খেলো তখন আমি ইস্কুলে পড়ি। বাগবাজারের কাশিমবাজার পলিটেকনিক। মামার বাড়ি থেকে কাছে। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় সমূহ টান। মাস্টারেরাও মন্দ বলেন না। মামা আশা রাখেন, ছেলে বড়ো হবে, মাতব্বর হবে, বাড়ির নাম রাখবে।

বাড়ি কোথায় ? বাড়ির আবার নাম কী ? রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐ বয়েসেই জড়িয়ে গেলাম। একা থাকার অপরূপ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেই, মনে হয়। কিছু বুঝি না, কিচ্ছু জানি না। বোঝানো হলো, রাতারাতি স্বাধীন দেশ স্বাধীনতর হবে ইত্যাদি ইত্যাদি—ধনী দরিদ্র থাকবে না, সম্পদের সমবণ্টন হবে। স্বর্গের একটা গোলকধাম-মার্কা ছবি আমাদের, বালকদের, স্বপ্নের দোরগোড়ায় লটকে দেওয়া হলো। বলছি না গুরুদেবরা ইচ্ছে করেই দিয়েছিলেন। ভুল বুঝে এমনটা বুঝিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের দোষ নেই। মনে হয় কিছুকাল স্বর্গ খুঁজতেই কাটলো—সেই সঙ্গে সামাজিক মানুষের গা ক্ষতবিক্ষত। ফেরার পথ থাকে না, তবু ফিরতে হলো। আবার সেই হলুদ পাকা কুঁচো-করা ঘাড় মুখ গুঁজে স্বার্থ গোছানো। ইস্কুল ডিঙিয়ে কলেজে। প্রেসিডেনসি কলেজের দিনগুলো স্মৃতি থেকে সরানো যায় না, কিছুতেই।

পড়াকালীন সময়ে সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেরই লেখার বাতিক ছিল। জনাকয়েক তো রীতিমতো বিখ্যাত। অলোকরঞ্জন দু ক্লাস উঁচুতে পড়তেন, শঙ্খ ঘোষ তাঁরও এক ক্লাস, শিশির দাশ আমার সহপাঠী। এখন দিল্লীর বিখ্যাত ডাক্তার অধ্যাপক সে। দেশ-এ তার কবিতা বেরুলে অধ্যাপকগণ আলোচনা করতেন আর আমাদের মধ্যে

তাড়াহুড়ো পড়ে যেত কে কীভাবে তার নেকনজর কাড়তে পারে। আমি তার পাশে বসতে পেলে উজ্জ্বল হয়ে উঠতাম। ঘুণাক্ষরে ভাবিনি, একদিন পদ্য লিখতে পারবো। তারপর একদিন দীপেনের (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) মাধ্যমে দীপক মজুমদার, তার মাধ্যমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ। সুনীলের তখন বৃন্দাবন পাল লেনে বাসা। আমার মামাবাড়ি থেকে কাছেই, প্রায় রোজ সেখানে আড্ডা মারতে যাই। সেখানে একে একে আনন্দ, ফণিভূষণ, মোহিত, শিবশম্ভুর সঙ্গে আলাপ। সন্দীপনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কবে যেন আলাপ হয়ে গেছে। তন্ময়ের সঙ্গেও। আমরা কোনো কোনো দিন দেশবন্ধু পার্কের জলের ধারে কোনোদিন বা গাছতলায় বসে গল্প কবিতা শুনি। মতি তার প্রথম দিককার অনেকগুলো গল্প আমাদের ঐ ধরনের আড্ডায় পড়ে। কবিতা পড়ে সবাই—আমি ছাড়া, তন্ময় ছাড়া। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ আমার পাড়াগাঁর স্মৃতি নিয়ে এক দু পাতা করে একটা আখ্যান লেখা শুরু করে দিই। দু দশ পাতা—যেদিন যেমন হয় পড়ে শোনাই। কেউ ভালো বলে কেউ চুপ করে থাকে। আমি দমি না—একদিন শেষও হয়। নাম দিই 'কুয়োতলা'। বছর দেড়েক প্রকাশকের ঘরে ধাক্কা খেতে-খেতে শেষ পর্যন্ত বেরোয়। একটু অদ্ভুত ধরনের বই হিসেবে অল্পস্বল্প নামও করে। ঐ পর্যন্ত।

ঐ ধরনের আড্ডাতেই বোধ করি উত্তেজিত হয়ে, পদ্য লিখবো মনে-মনে এক রকম স্থির করে ফেলি। তখন তরুণ রচনার অগ্নি, মানেই কৃত্তিবাস। অন্যদিকে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকা। সঞ্জয়বাবুর পূর্বাশা টিম টিম করে জলছে। রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে হিসেব মিলিয়ে একটা সনেট খাড়া করি। পরের দিন সুনীলের বাসায় যাই। লেখাটা অতি সাধারণ 'যম', ওর কাছ থেকে কবিতা-র ঠিকানা নিয়ে বুদ্ধদেবকে পাঠাই। উনি চিঠি দেন, সামান্য সংশোধন করে ছাপবেন। হাতে স্বর্গ পাই—কিংবা, মনের মধ্যে কী যেন এক অবাস্তব হাওয়া বাড়তে থাকে। প্রায় দৌড়ে সুনীলের কাছে গিয়ে চিঠিটা দেখাই এবং দু তিনটি টানা গদ্যে-লেখা 'সুবর্ণরেখার জন্ম' আর 'জরাসন্ধ'। সুবর্ণরেখা কৃত্তিবাসের জন্যে রেখে দিলে পরের ডাকেই জরাসন্ধ বুদ্ধদেবের কাছে পাঠাই। পদ্য লেখার আকস্মিক জন্ম, প্রকৃতপক্ষে সেদিনই। কোনো

প্রেরণা না, কোনো সনির্বন্ধ ভালোবাসায় না—শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জ-এর মুখোমুখি এসে এইসব পদ্য লেখা।

পদ্যর বই প্রকাশের ব্যাপারে কালানুক্রমিকতা বজায় থাকেনি আমার কপালে। এবং তা মূলত প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানের দোষেই। কোনো কোনো গ্রন্থের পদ্য পরে খুঁজে পাওয়া গেছে—ফলে, প্রকাশিত-হতে-যাচ্ছে এমন কোনো বই-এর মধ্যেই তাকে গুঁজে দিতে হয়েছে। ছ সাত বছর আগে লেখা কবিতার বই এখনো প্রকাশকের ঘরে পড়ে। অথচ তার পরের পদ্য গ্রন্থে চলে যাচ্ছে। এবং সেজন্যেই, কাব্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে আমি প্রয়োজন আর স্বেচ্ছাচারিতাকে সবার ওপরে বসিয়েছি। কালাকাল মানিনি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ঈশ্বর থাকেন জলে

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮২ মে, ১৯৭৫

রুবি ও শেখর-কে

অনাময়-এর উদ্দেশে

দরজা বন্ধ থাকলে তোমাকে ডাকতে পারতুম, বলতুম
ভিতরে নেইই যদি, তবে, সাড়া দিচ্ছো না কেন ?
তোমাকে মনে পড়লেই আমার এই ওলোট-পালোট পঙ্‌ক্তিদুটো কাছে আসে
ভয় হয়, তুমি আবার না আসো—এখন তোমাকে দেখলে আমি ভয় পেতে পারি
অন্ধকারে, আমাদের উঠোনের শিউলিগাছের উঁচু-নিচু দুপথেই দুটো
এরোপ্লেন যেতে দেখেছি আমি

ভয় পেয়েছি, আমার মুখের উপর দিয়ে পত্তর পাতাগুলো উড়ে যাচ্ছে
হাওয়া নেই, ভাদ্রের শেষে হাওয়া থাকার কথা নয়, হাওয়া নেই—
তবু, তোমাকে মনে পড়ামাত্র সেই হাকুচ্‌-তেতো পাতাগুলো, সেই
পাতাগুলো—

সব কিছু তুমি চিনতে—আঃ, আমাকে শেষ করতে দাও, কলম কেড়ে নিও না
দোহাই অনু—

তোমার সমালোচনা পরে শুনবো, আমার শেষ কবিতাটা (?) শেষ
করতে দাও

যেভাবে তুমি নিজেই শেষ হয়েছো, সেভাবে এই—
জানো শক্তি, অনাময় মারা গেছে—এই বলে সুনীল বাসের মধ্যে দৌড়ে
দুপুরে—কিংবা

কে ? মারা গেছে ? কোথায় ? ভরদুপুরে ? তারা-দের তো কুলুঙ্গি
ভর্তি করে থাকার কথা এখন—হাত আড়াল করে, তারা
ছিঃ শক্তি, অনাময় দত্ত গত পরশু (কোন হাসপাতাল) থেকে
আর নেই, তন্ময়ের ভাই—
তোমার শোক-সভায় আমি যাই নি, তোমাদের নতুন বাড়ি শ্যামবাজার
মোড় থেকে বাসে, হেঁটে—জানি না কোথায়

তাই, আগে যেখানে থাকতে, আমাদের বাড়ির কাছে আর রেলব্রীজের
কাছে, সেখানে আজ শান্তি

বহুবার গেলাম—কালো খোলা নর্দমার পাশ দিয়ে স্থূলবয় হেঁটে যাচ্ছে,
রাস্তার ওপাশে

তন্ময় আর আমি কাঠগুঁড়োর চা খাচ্ছি তক্তপোশে বসে

তোমাদের সেই বাড়িটা সেখানেও ভেঙে গেছে—গত পরশু থেকে আর
নেই, তন্ময়ের ভাই, তন্ময়ের
ভায়ের বাড়ি
শুধু সাদা থান, মেঘে ঢাকা কালো পাথর, পাথরের জঠর—যিনি ছোটবেলার
আমাকে
'ঠাকুর' বলাতেন, তাঁর কাছে কেবলই ক্ষমা চাইছি, অনাময়ের শূন্যতার উপর
কবিতা লেখার ইচ্ছা
আমার ছিলো না॥

যৌন ছড়া

১

ডোঙায় চড়বো—তুমি আমার সঙ্গে গেলে
কাল্‌কা-মেলে
অনেক বগি
তুমি আমার তাল-ডোঙাটি, আমিই লগি।

মিথ্যেভাষণ করবো শুধুই সন্ধে হলে
বলবো, দুপুর
যখন দু-থাক্ শরীর হচ্ছে উপুর্যুপুর
সূর্য টলে
পড়ছে, যেন কাঠবিড়ালী—বৃষ্টি এলে
ডোঙায় চড়বো, তুমি আমার সঙ্গে গেলে।

২

বুক জলে তুই কি সুখ পাবি
নয় সমুদ্র, নীলের ঝাপ্‌টা
তালা ভাঙতে আনলে চাবি
ঘর জুড়ে দ্যাখ্‌ শূন্য কাপটা

ঐ কাপে রঙ গুললি যদিই
লেজ তুলে দ্যাখ নৈ না এঁড়ে
নদীর নাম তো নিছক নদীই
এ-ও বুঝলি না আমোদ-গেঁড়ে ?

৩

ঐ লিচু ঝুলছিলো ডালে
কে গ্‌গায়ে তার দাঁত বসালে
বাদুড়, ও তোর নখের ঝুড়ি
নাকি ঐ ও পাড়ার ছুঁড়ি ?

ঐ লিচু ঝুলছিলো ডালে
কে গ্‌গায়ে তাঁর দাঁত বসালে
দাঁত কি ক্ষেতেও দাগ লো শসা—
এক মশারি, তুই কি মশা ?

এদেশ দেবে না ধরা

স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, ওঠে হরিধ্বনি—শেয়াল রা কাড়ে
শহরতলির সেরা চৌমোহনি, রাত একা বাড়ে
ওষ্ঠ্য পিপাসার মতো—এখন টুপটাপ ঝরে হিম
অন্ধকার ট্রামলাইনে পড়েছে জাতকশূন্য ডিম
কানাভাঙা ভাঁড়ে
বিপুল তাড়সে রস পান করে বিশালাক্ষী রাঁড়ি
বারুদে গরম পল্লী সজারুর স্বপ্নে ভাসমান
এদেশের সাধারণ্য, বেতারে নিশ্চিন্ত ওঠে গান
কিছুতে যাবে না ধরা, আলেয়ার মতন উত্তরে
ক্রমাগত ভ্রাম্যমাণ—বুদ্ধের আলেখ্য ? নাকি ঝড়ে
করুণ কামিনীগন্ধ তাৎক্ষণিক ? পরলোকপ্রিয়
এদেশ দেবে না ধরা। সাংকেতিক কিন্তু রমণীয় !

ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র

ইন্দ্রিয় সজাগ করে হাতুড়ির স্ববিরোধী ঘা
থেমে যা থেমে যা।
একি সাপ ?
পুণ্যের মোড়কে বন্ধ, আলস্যজড়িত অন্ধ পাপ…
কাঠঠোকরা ?
ইন্দ্রিয় সজাগ করে, হাতুড়ির স্ববিরোধী ঘা
থেমে যা থেমে যা।

২

মধ্য সমুদ্রের নৌকা সঙ্গহীন

মনীষার মতো

পাংশু

৩

কালো জল, উপরে কাপ্তান

কাশবন

দিগন্তে ছড়ানো

সিঁদুর, সন্ন্যাসী-রেখা···

এ সবেরই মধ্যে ভ্রাম্যমাণ

বিষাদ সঙ্গিনী ছাই

রাজনীতি মাৎসর্য জড়ানো

কালো জল, উপরে কাপ্তান

কাশবন

দিগন্তে ছড়ানো।

৪

উল্টোপাল্টা, হাতে পথ কাটে, পদতলে তালি দেয় কবন্ধ
চোখ টিপে খায়, হাঁ করে লজ্জা, দ্বার খোলা মানে কপাট বন্ধ
এই আতঙ্ক, মানে ভালোবাসা, নীল ছিঁড়ে দিতে আকাশ টুকরো
বাক্স বিছানা অন্তরে পাতা একফালি চাঁদ পারলে উগরো
মাথার পেছনে, অর্থাৎ পায়ে সাপ-খোপ-মেশা তরুণ ছুকরি
আলস্যে, ঘাসে চিৎ হয়ে আছে কনকখচিত বেতের টুকরি
অর্থাৎ কণা-কবিত্ব শেষ, ঝোড়ো চাপা বনবকুল গন্ধে।
আতঙ্কে মনে ভালোবাসনায় সাঁতার কেটেছে ব্যাকুল অন্ধ॥

সাম্প্রতিকী ১৯৬৬

১

বুকের মধ্যে চাষ করেছি একপো প্রেমের ধান
তার আবার খাজনা কতো
কার যে সর্বনাশ করেছি স্বতঃই সন্দিহান
সে-ভুলের বাজনা কতো
মিষ্টি ফলের তেষ্টা আছে, বাজারে তাই টান
সে কি কেউ কিনতে পারে
আলোর মধ্যে বসে দেখছি জীবন ছত্রাখান
ছিলো না অন্ধকারে !

২

সমস্তটাই প্ররোচনা, সমস্তটাই ফন্দি
বাইরে শুধু ভিড় বাড়াবে ভিতরে তাই বন্দী
বস্তা বস্তা কাঁকর দিলুম উদর রইলো আস্ত
হাত বাড়ালে টিঁকোনো দায় স্বাধীনতার স্বাস্থ্য
সমস্তটাই প্ররোচনা, সমস্তটাই ফন্দি
বাইরে শুধু ভিড় বাড়াবে ভিতরে তাই বন্দী।

এক যে ছিলো রাজার প্রাসাদ হাজারটা তার দরজা
রাষ্ট্রপতি ছিলেন কবি, এখন গাঁথেন তরজা
অল্পস্বল্প বিদেশে যান দেশের বাজার মন্দা
খাদ্য চেয়ে করছি মাটি—শিল্প যোজনগন্ধা
সমস্তটাই প্ররোচনা, সমস্তটাই ফন্দি
বাইরে শুধু ভিড় বাড়াবে, ভিতরে তাই বন্দী !

সে কই ?

ওইখানে ওর রোদ পড়েছে, ওইখানে ওর ছায়া
একখানে জল, অন্যখানে পা রেখেছেন হাওয়া
কিন্তু সে কই ?   শূন্য দালান, মুখবোজা মাটকোঠায়
কোন্ সাহসে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্রী রোঁয়া-ওঠা
পুষ্যি কুকুর একটি মাত্র, ওর পাহারার মানে
যে নেই তাকে ভরিয়ে রাখার কঠিন সন্নিধানে।
তাই বলে কি পারে ?
শর্ত ছিলো আমার এসে ঢুকলে কারাগারে
তক্ষুনি তার ছুটি।
'মুক্ত, আমি মুক্ত' বলে দরদালানের খুঁটি
পালিয়ে যেতে চাইলে, কষে কামড়ে দিলো পায়ে—

সেই যেখানে রোদ পড়েছে, সেই যেখানে ছায়া
একখানে জল, অন্যখানে পা রেখেছেন হাওয়া
কিন্তু, সে কই ?

ঐ গাছ

একটি নিষ্পাপ গাছ আমাদের মাটিতে বসেছে
বাস্তুর নিকটে আছে, বুকভরা মায়ার নিকটে
পিতৃপুরুষের স্নিগ্ধ স্মৃতির মতন কেশপাশ
এলিয়ে রয়েছে ছায়া, সীমাহীন রোদের ভিতরে
যেন ঠাণ্ডা প্রেম তার কুয়োতলা নিয়ে আছে কাছে
মানুষের অগোছালো শান্তি ও অগ্নির
পারম্পর্য মেনে নিয়ে, মেনে নিয়ে প্রকৃত চিন্ময়
রূপ তার, ঐ গাছ আমাদেরই মাটিতে বসেছে ॥

শব্দ বোঝাই তরী আমার স্বপ্নে ডুবেছিলো

সব যেখানে থাকে এবং আড়াল করে রাখে
আমি তাকেই খুঁজে মরি
শব্দ বোঝাই তরী
আমার স্বপ্নে ডুবেছিলো
ঠিক এইখানে এইখানে
এবং স্বপ্নে ছিলোই মানে
আমার স্বপ্নে ছিলো মানে
এখন হাতভরা নীল ফাঁকি
তবু, তাই নিয়ে তো থাকিই
এবং শব্দ বোঝাই তরী
আমি তাকেই খুঁজে মরি
আর কি কোথাও গেলে পাবো
এবং দু'চক্ষে হারাবো ॥

ওদিকে যেও না তুমি আর

বেজে ওঠে দূর টেলিফোনে
কাঁ টা তা র
ওদিকে যেও না তুমি আর

ওদিকে যেও না তুমি আর।
আছো তুমি ভালো।
দুইটি বিড়াল-সাদা-কালো
আছে দুই হাতে
কথা হবে তোমাতে-আমাতে।
সে-কথা কি আজো পড়ে মনে?
বেজে ওঠে দূর টেলিফোনে
কাঁটাতার
ওদিকে যেও না তুমি আর
ওদিকে যেও না তুমি আর ॥

অন্বেষণ

এই লালবাড়িতে কে আছে?
হৃদয়স্পন্দন?
এখানে আছে কি লোকজন
না, ভূতুড়ে?
পাবো তাকে দশহাত খুঁড়ে?
পাবো তাকে বিশহাত খুঁড়ে?

তুমি

হঠাৎ ছুটে বললে এসে, দেখি
ওদের মাঠে সন্ধ্যা নেমেছে কি!
উড়ো পাতার ফাঁদে
রাতের ঘুড়ি আটকে গেছে তোমার অপরাধে—
এলে বিদেশ ঘুরে ?
হঠাৎ, তুমি অলীক ছায়া উঠেছো মাঠ ফুঁড়ে
তোমায় দেখে কই
কাছের খেলা থামে নি দূরে ওঠে নি হৈহৈ
কি বাপু তুমি লোক!
তোমায় কথা শিখিয়ে আনা হোক—
ওদের কথা বলো—
নদীর বুকে জলের রেখা আলোয় ঝলোমলো।
কে করে হাহাকার ?
তোমার মুঠি ওঠে না ফুটি আমার হাতে আর ॥

নৌকা থেকে

নৌকা থেকে লাফ দেয় তীর--
আমরা কি তবে পৃথিবীর ?
না কি জলে ?
আমাদের রক্তে মখমলে
আছে মাছ
তবে তো তোমারি যোগ্য গাছ
পাকাবাড়ি
সেখানে কিভাবে যেতে পারি ?

স্বাধীনতার জন্যে

বুকের রক্ত মুখে তুললেও কবি বলে মানায় না হে
আজকে—বড়ো স্পষ্ট সকাল
বুলেট বুকে বিঁধলে তুমি যোদ্ধা হবে কিসের মোহে ?
আজকে—বড়ো স্পষ্ট সকাল
মেরেই মরো
সমস্তদিন সমস্ত রাত বুকের মধ্যে তৈরী করো :
স্বাধীনতার জন্যে, নচেৎ কিসের লড়াই ?
'—সট্‌কে পড়ো। সট্‌কে পড়ো।'
সমস্তদিন সমস্ত রাত বুকের মধ্যে তৈরী করো ;
স্বাধীনতার জন্যে, নচেৎ কিসের লড়াই !

আজ সকলই কিংবদন্তী

আজ সকলই কিংবদন্তী, পাতালে বাস করলে গুঁড়ো
সন্ধ্যেবেলা পা ছড়িয়ে বসতে নাকি পাহাড়চুড়োয় ?
নিত্যি নতুন পোক্ত তাড়ি
সর্বনাশের স্বপ্নে-মেশা আঁধার-করা বিষের হাঁড়ির—
শক্তি, খেতে একচুমুকে, মন্দ নয় সে-কাণ্ডখানা !
জগজ্জীবন চমকে দিয়ে ভাসতো সুবাস হাস্নুহানার—
আজ সকলই কিংবদন্তী !

রগচটা কোন্ পন্থে জবর
থাকতো লেগে জাদুর ছিটে, সন্ন্যাসিনীর গোপন খবর
গোমাংসবৎ পরিত্যাজ্য—
আজ জিতেছো নকল রাজ্য সৌদামিনীর···
হয়তো ভালো

এই জীবনের সবটুকু নয় তীব্র আলোয়

জ্বলতে থাকা

পথ বলে সব ন্যাংটো তো নয় ? পুছে ঢাকা।

কিন্তু যারা বহির্মুখী
বিষণ্ণ ধান ভাঙছে নোড়ায় জনমদুখী
শব্দে-রঙে সাত শ ঝাউয়ের কান্নাতে ছাই
ছড়িয়ে দিয়ে বলছে, তাকে এম্‌নি সাজাই—
মতান্তরে, অঘোরপন্থী
আজ সকলই কিংবদন্তী।

স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল

নিশ্চিন্ত খোয়াই, হাওয়া ; তার মাঝে আমার পুরোনো
ভেসে আসে শতচ্ছিন্ন স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল···
জালের ওপারে বন, বনের ওপারে ওঠে মেঘ
বিলিতি খুশির মতো আব হাওয়ায় বুনো মুরগি ডাকে
আমরাও ডাকি তাঁকে, যিনি একদিন
পাখির মতন উড়ে কিছুদূর কাজুবাদামের
সঙ্গে দৌড়ে গেছিলেন
পরবাস নাম্নী বাড়িটাতে···
ছিলেনও কয়েকটি দিন, রুগী যেম্‌নি হাসপাতালে থাকে!
নিশ্চিন্ত খোয়াই, হাওয়া ; তার মাঝে আমার পুরোনো
ভেসে আসে শতচ্ছিন্ন স্মৃতির রাংচিতা বেড়াজাল···

আসল গল্পটা

আমি জানি না পথ আমাদের কোন্‌দিকে নিয়ে যাবে
ডানদিক বাঁদিক—দুদিকেই যেতে পারা যায়
শুধু যাওয়াটাই চাই—ঐটেই আসল কথা
সেখেনে কাঁধে-কাঁধে না মিললেও
যাওয়াটা নিশ্চিত করতে হবে।

আগেভাগে কথাটা ঠিক করি—ঠিক ক'রে রাখি
আমাদের নতুন একটা ইস্কুল চাই
ছেলেপুলে বড়ো ছোটো নিজেরাই ঠিক করে নেবো
শেখাবো
যা কক্‌খনো কাউকে শেখাতে পারি নি:
ঐ পথের কথাটাই আসল নয়,
ডানদিক বাঁদিক দুদিকেই যেতে পারা যায়

যেতে হবে
দুটো পথের ওপারেই রোদে-পোড়া কালো মাটি
আমাদের নতুন ইস্কুলটা ওখানেই গড়ে তুলতে হবে
যেখানে কথার বদলে কথা নয়
নয়, হাসিখুশি নিউ ধারাপাত…
যেখানে একচোখ গাল্‌লে শয়তানের দুটো চোখই গেলে দেওয়া
অষ্টাভুজকে করা ঠুঁটো-ফুঁটো জগন্নাথ

তাহলে আসল গল্পটা সেই দেশলাই-এর নির্জন একটা কাঠির
শুধু ধরিয়ে দেবার ওয়াস্তা!

কবির মৃত্যু

[কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য স্মরণে]

মৃত মুখ, তাকে আমি কুয়োর জলের মতো স্তব্ধ মনে করি
পাতালের তাপ যদি কিছু থাকে, তাকেও স্থিরতা
কঠিন আঙুল তুলে ঘুম পাড়ায়
ধ্যানমগ্ন করে…
আমি ভয় পাই, আমি মুখ ঢাকি, বাস্তবে তবুও
কবির গণনা বলে, ও-মুখ-পাষাণই প্রিয়তম
রূঢ় সুষমার পঙ্‌ক্তি, ওই শব্দ, স্মৃতির জননী…
কিন্তু সে-কবিও যান হাতে-গড়া শস্যক্ষেত্র ছেড়ে
একদিন
পাকা ও প্রসন্ন ফল ঝরে পড়ে তপোক্লিষ্ট ভুঁয়ে
শীতের বাদাম করে ওড়াউড়ি, ময়দানের ঘাস
গভীর আগুনে যায় উড়ে-পুড়ে…
দেখে মনে হয়
কলকাতা কবির মৃত্যু সমর্থন করে ॥

নষ্ট একটা ফল

নষ্ট একটা ফল যেন তার সারাজীবন সামনে আছে
শুকনো কিছু পাতা এবং উই-খাওয়া অস্পষ্ট গাছে
নষ্ট একটা ফল যেন তার সারাজীবন সামনে আছে
সামনে থেকে পচছে একাই—
দেখা, আমার স্পষ্ট দেখা
উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেমন সবার, সামনে থেকে পথ দেখাচ্ছে
নষ্ট একটা ফল যেন তার সারাজীবন সামনে আছে ॥

ও ফুল আমার

ফুলগুলো সব ফুটে উঠতো আমার কথা মনে পড়লে
মনে পড়লে কেমন আমি একক ছিলাম ভালোবাসায়
ভিজতে ভিজতে পার হয়েছি সম্মুখে মাঠ আকাশসিন্ধু
যেন বুকের বৃষ্টিবাদল সব ঢেলেছে মাথায় আমার
ভিজিয়েছিলো কাপড় যখন খুঁট ছিলো ভিতরে বন্ধ
এবং কথা তোমার কথা ও ফুল আমার মনে পড়ছে

মনে পড়ছে ও ফুল তোমার কথার মধ্যে কাহার কথা
নামটি কি তার বকুল-পারুল এবং ছিলো স্মরণীয়ই
শুধুই ছিলো স্মরণীয় ? আজ প্রকৃত স্মৃতিতে ম্লান
ধুলোর মতন অনিবার্য, অনিবার্য ব্যথার মতন
মনে পড়ছে ও ফুল তোমার কথার মধ্যে কাহার কথা ?

উদ্ভিদের মতো কৃতী

উদ্ভিদের মতো কৃতী, তবু তাকে বর্জন করেছি
পাগল যেমন করে স্বচেতন আশ্রয় সহসা
একদিন, মনে মনে, কাছে থেকে দূরত্ব-প্রয়াসী
নিজকে বিচ্ছিন্ন করে, গুণমুগ্ধ তারই ভগ্নদশা
দেখে সে সংবিৎ পায় ফিরে, কিন্তু নিজে থাকে দূর
পাগল ফেরে না ঘরে, ফেরে তার সংশ্লিষ্ট মধুর—
উদ্ভিদের মতো কৃতী, তবু তাকে বর্জন করেছি ॥

ঘাসের ভিতর ঘাস

ঘাসের ভিতরে ঘাস কতো সুখে শান্তি হাত করে
ক্লাস-কেটে ছেলে যেন হাতে-পায়ে খেলার জোয়ার
সবুজ নদীতে তারি ঢেলে দেয়, কিন্তু যে গোঁয়ার
অন্তর-বাসিন্দা নয়, তার কাছে সজীবও খড়্খড়ে
শুকনো, খাঁড়া
শান্তি যেন শস্য-খড় ছেঁকে-নেওয়া ভাগ্যহত নাড়া—
উৎসব-প্রসঙ্গ শুধু, শামিয়ানা, সংঘর্ষসমীপে
অখণ্ড ফুৎকার হ'য়ে উঠে আসে প্রাণশূন্য ছিপে…
ঘাসের ভিতরে ঘাস কতো সুখে শান্তি হাত করে ॥

খুনে ও খেয়ালে

ধ্বনির সমষ্টি থেকে ছাড়া পেয়ে, ছাড়া পেয়ে নয়
যে কোনো কারণে হোক কারাগার কপালে বসেছে
খাঁচাকাঠি, লোহার গরাদ
কিংবা আমি বাঘের ভিতরে
স্বচ্ছ ও নিরুপদ্রব
ধ্বনির যে বর্ণ তাকে ঘুষে বশ
স্তুতিতে পাথর
ক'রেও দেখেছি আমি একা নই
কারাগার আছে
স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ দোষী যেন বাঁধা খুনে ও খেয়ালে ॥

মানুষের মধ্যে থেকে

মানুষের মধ্যে থেকে, মানুষের মধ্যে থেকে নয়—
আমি দুভাবেই তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন
জানিয়ে এসেছি—এই এতোদিন, সম্পদে-বিপদে।
আজ কোনোভাবে তাকে সমর্থনযোগ্য মনে হয়
তোমাদের কাছে ? তার খেলাধুলা, গূঢ় আচরণ !
এর চেয়ে বনবাস ঢের ভালো—হিংস্রে আছে নীতি।
এখানে মানুষে শুধু মুখে বলে : নিশ্চিত সম্প্রীতি
আছে আর আছে ব'লে মাঝেমধ্যে তুমুল বৈঠক
বসে দলমত ধর্মনির্বিশেষ মানুষে মানুষে···
কুকুরও কীর্তন গায়, ঠেকা দেয় বৈরাগী বিড়াল !

সুর ও ছন্দের চেয়ে শব্দ

অস্পষ্ট, সোনালি সুতো, ক্ষ্যাপা জাল
পিছনে ছড়াই
ওঠে মাছ, তরঙ্গের দাগ লেগে
জল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক
অস্তিত্বের মতো একা
কেন হিংসা ? গূঢ় নির্যাতন ?
কেন ছেলেখেলা…এই
জাল ফেলা রঙিন সেতারি ?
সুর ও ছন্দের চেয়ে শব্দ কিনা বিষাদে শয়ান ?
ধ'রে দেখা
ধ'রে ধ'রে দেখা…
অস্পষ্ট, সোনালি সুতো, ক্ষ্যাপা জাল
পিছনে ছড়াই ॥

এক হতচ্ছাড়া যুদ্ধ চাই

কথা বলতে বলতে এক নদীর ধারে পৌছুলুম
সেখান থেকে বিনি-মাগ্‌নার খেয়া
এপারের হাতছানি ওপার থেকে আমায় টেনে এনেছে।

কথায় কথায় জন্মমৃত্যুর উড়ো হাওয়াটা পাক্ খেয়ে গেলো
মধ্যিখানে রাতুবাম্‌নির চর
তার ভেতরে পানকৌড়ির বৃষ্টি মাথায় খোলাছাতা
এবার তাহলে আসল ব্যবসার কথাটাই তুলি ?

কানেতে মন লাগলে দেনা-পাওনায় আটকাবার জো নেই
নিন্দুকেও জানে, দুপারের লোক কিসের জন্যে কোমর বেঁধে বসে আছে
মোটকথা, এক হতচ্ছাড়া যুদ্ধ চাই, নদীর বুক-শুকোনো যুদ্ধ
যাতে ক'রে এ-জমির কান ও-জমির প্রাণে গিয়ে বাঁধা পড়ে।

নিজের জন্য

থাকতে দেবে না
আমাকে এমন জড়ো ক'রে ভুল রাখতে দেবে না
নিজের জন্য
কুয়াশার কাছে আধ-মরা গাছে সে দেখে এসেছে ঘন অরণ্য
থাকতে দেবে না
আমাকে এমন জড়ো ক'রে ভুল রাখতে দেবে না
নিজের জন্য ॥

আমি সহ্য করি

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমায় ক্ষুধা আর প্রাণপণ গাছের শিকড়
যন আমি মাটি, যেন কলকাতার প্রধান সহ্যের রাস্তা, যেন আমি
দেড়বস্তা রাক্ষুসে বাচ্চার জন্যে দুধহীন মাই খুলে রেখে বসে থাকি
আর দাঁত চিবোয় চামচিকে মাংস তার···খেলা করে, তাছাড়া মৃত্যুর সঙ্গে
আর কোন্ কূট কাজ ওর ?   ঐ ছেলেদের ?

আমি সহ্য করি···

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমায় ক্ষুধা আর প্রাণপণ গাছের শিকড়
যেন আমি মাটি, যেন পড়ো ঘর, পুকুরের পাঁক
যেন আমি সমস্ত নিষ্ফল চেষ্টা শিল্পপথিকের, যেন ভ্রষ্ট রাজনীতি
যেন আমি সকল নির্ভুল অঙ্কে গোলযোগ, সাহিত্যে তীক্ষ্ণধী
সহ্য করি প্রেমতাপ, ছেড়ে-যাওয়া গাড়ি ইষ্টিশানে
যেন আমি কিছুকিছু মানুষের জন্যে নয়, সকলের জন্যে বেঁচে আছি
যদি বেঁচে থাকা বলে, যদি একে চলচ্চিত্র বলে।

মাঝেমাঝে মনে হয়, কলকাতার পয়ঃপ্রণালীর
মধ্যে থেকে উঠে আসে, আজীবন যে শুয়ে রয়েছে···শিশু
যার সামাজিক মাতা-পিতা নয় স্তম্ভিত ক্রীড়ায়
যে বোঝে সবার মধ্যে লক্ষণীয় স্থান নেই তার—
নিতে হবে, ছলে-বলে, কেড়ে ও কৌশলে
রক্তে ও চোখের জলে ভেসে যাবে গাঙ্গেয় কলকাতা···
শিরার সড়ক খুলে ঢালা হবে প্রসিদ্ধ বিদ্যুৎ
জ্বলবে ও জ্বালাবে তাকে এবং কলকাতা জ্বলে যাবে ॥

পচা নষ্ট ফল আমি

পচা নষ্ট ফল যেন হৃদয়ের ঘাসে
গড়িয়ে এসেছে তার অবিশুদ্ধ গোল পাপ নিয়ে…
গু-গোবর মাটি-পাঁক সারাৎসার
পিঁপড়ে সিসিফাস
লক্ষণীয় শুঁড় তোলে বিষণ্ণ গোধুলি-পোড়া ঢিবি
তারও শীর্ষে, ন্যাড়া মর্যাদায়

যদি আসে
পণ্ডশ্রম পার হয়ে যদি আসে শোলার মুকুট
একলক্ষ তঙ্কা চেক্‌
জয়হিন্দ সরকারি কোষের!
তাহলে তেমাথা ফাঁক
হয়ে যাক ধুলোট্‌ লড়াই
ভোক্তা রামকৃষ্ণজীবী কিংবা ভক্ত ষড়ংগী-গড়াই

আমি তো তৃতীয়পক্ষ
গাছেরও না, বিক্রেতারও নয়
পচা নষ্ট ফল আমি হৃদয়ের দুকূলে গড়াই ॥

রাইনার মারিয়া রিলকে

ফ্রম দি রিমেন্স অব কাউন্ট সি ডবলু

ফ্রম দি রিমেন্স অব কাউন্ট সি ডবলু ১৯২০-২১ সালে রচিত। উইনটের-থারের লাগোয়া আর্চেলের শ্লস্‌বর্গ নামের এক দুর্গে এর সমস্ত পদ্যগুলি লেখা হয়েছিল। কবির এই স্বেচ্ছানির্বাসন স্থায়ী ছিলো চার মাস। সেই বিশাল দুর্গে তিনি এবং একজন মাত্র দুর্গরক্ষী ছাড়া ছিলো না কেউ। এই পদ্যগুলি সম্পর্কে তিনি এক রহস্য তৈরি করেছেন। সমসাময়িক চিঠিপত্রে—ফ্র য়ুনডারলি ভলকার্টের কাছে লেখা চিঠিতে, মেরলিন-এর কাছে লেখা চিঠিতে ও কিপ্পেনবার্গ-এর কাছে লেখা চিঠিতে। তিনি বলেছেন যে, এই দুর্গের এক প্রাক্তন স্বামী সময়ে সময়ান্তরে তাঁর সামনে বসে পদ্যগুলি উচ্চারণ করেছেন ও তিনি অনুলিখিত করেছেন মাত্র! তিনিই কাউন্ট সি ডবলুর প্রেত!

১

এই ভোরবেলা, আয়না, স্বাগত জানাই আপনার
ফুলে-ওঠা রগ এবং জরাগ্রস্ত মুখের রেখারে।
তুমি যে, শিশুরও শিশু, যদি দেখা হয় পরস্পরে,
হয়তো যথেষ্ট নয়, সে-প্রসঙ্গে হৃদয় আমার।
জমির সরল পথ ধরেই এগুবো দুজনাতে—
ফলের কোরকগুলি ক'রে গেছে গুঞ্জিত, আক্রান্ত।
ভালো লেগে যায় সবই, প্রিয় দুরাশার পরিবর্তে ;
বাক্য ফ'লে ওঠে, তাও ; যা ছিলো বোবার মতো শান্ত।
তখনই আমার হাসি অতিরিক্ত পিতৃত্ব-প্রকাশী
হ'য়ে পড়ে ; কেননা, সে এর লক্ষ্যে ছিলো অপেক্ষিত।
নতুন, দ্যাখো নি আগে, অদ্ভুত, অসহ, এই হাসি
জীবনে, প্রথম দেখছো কলকাতায় বন্ধু-পরিবৃত।
—নাও, আমি বলি, একে দীর্ঘায়ত ল্যাণ্ডস্কেপ-সম
জানোই যদিবা এর পরিমিত প্রভুত্ব-শক্তিরে—

*　　*　　*　　*

এখনো কাটলো না বাল্য, ছেলে, এই অগ্রস্মৃতি মম
একী জয়-করা তুমি ? অথবা কে জয় করে মোরে ?

২

এলেও অনেক পরে, তাও যেন দুঃখের সমুদ্র
ভিতর ভাসাচ্ছে জলে ; ফুটে উঠছে ক্ষিপ্র অভিঘাত।
পাণ্ডুর মুখের যদি সবটুকু সরাতে পারতাম,
কিংবা ফুলবাগান-সম প্রবিষ্ট হতাম মর্মমূলে
ভালো হতো হয়তো, এই সম পরিমাণ সন্তপ্তের
বলার থাকতো না কিছু।
অনেক আগের তুমি—নিমেষপাতেই অভিনব।
সহসা ভুল হতে পারতো বস্তুগত কারণবশত ;
কেননা, তোমার মুখ ঝ'রে গেছে গোলাপের মতো,
পাতার চেহারা শুধু বলে দেয় প্রকৃতি গাছের—
তাও ইতস্তত করে।
আমি দুঃখভ্রষ্ট, আমি তোমার প্রেমের ঢের নিচে
শুয়েছি শৈবালে, স্বচ্ছ জলধারা-সাজানো টেবিলে—
অর্ধ-পরিচিত জিপসি ; বহুলোক দেখতে আসছে লোভে,
এক জন্মে জন্মান্তর দেখে চ'লে যাচ্ছে অহরহ।

৩

ওকী এলো ওকী হাওয়ার বাহন কেউ ?
মাথার কাছে জানলা ছিলো খোলা আমার
ডোবার পাশে কাঁদছে একা ফেউ
এই তো সময় আমার ঘরে তাঁদের নামার।
কিম্বা গুপ্ত, ছদ্ম-ভঙ্গি জাগালো কে—
একা, বিষম একা, দুর্গে আমায় দেখে ?

অনেকখানি মেলে, ওকী ঘুমন্ত কেউ
বিছানাময় উল্টে গেল ; সকল অর্থে আমার
মনের কাছে ধরলো মানে, ইতস্তত ঢেউ
ছড়িয়ে পড়লো ভূতের মায়া সকলে সর্বত্রে, আমার
সাড়া তবু ক্ষীণ ওদের ব্যগ্র ডাকে—
রক্ষা করতে বলছে বালক মৃত্যু থেকে।

হয়তো এমন ক'রেই তুমি দেখাবে সব
আমায়, সকল দ্রব্য যারে ফেলে যাচ্ছো।
হাওয়ায় উড়ে পড়ছে সকল অতৃপ্ত রব—
তোমার, তোমার, তোমার থেকে সবই স্বচ্ছ।

৪

ঠুন্‌কো চাঁদের ভাঁড় ভেঙে যাচ্ছে মেঘের হামলায়
ওদেশে ; সমস্ত জলে, সর প'ড়ে গেছে সে-চাঁদের—
অমিশুক রসে-রক্তে ইতস্তত তারার গামলায়
নীলগাই, সাদাগাই খড় খেতে ডুবোচ্ছে চিবুক।
ছাঁচতলায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই তুমি করো গান
ততোদূর যেতে পারো, পালাতে পারো না একেবারে॥

কিন্তু আমায় বশ করে কে

আমার মতন রাজ্যসুদ্ধ ঠুক্‌রে ঘোরা ভ্রমণকারীর
দেখা তোমরা অবশ্য চাও
যাবো, আমি যাবোই—আমি কথা দিচ্ছি
দেখতে না পাও
মনের মধ্যে খুঁজলে পাবে আমার লেখা চিঠিপত্র
যাবার কথা লেখা এবং ফিরে আসার
সহাস্য মুখ, বিদায় বিদায়…
রাজ্যসুদ্ধ ঠুক্‌রে ঘুরে আজকে শুধুই মনে পড়ছে—
বসলে হতো
মগডালে নয় গাছের নিচে কিংবা কোনো পুষ্করিণীর
যেখানে মাছরাঙা থাকেন ধেয়ান-মগ্ন
সেইখানে তার পাশটি ঘঁষে, বসলে হতো
সত্যি কথায়, বসলে হতো
বুকটি জুড়ে

এই ঘুনাঘুন্ তবলা বাজে একটিমাত্র তালের ফেরে

বসলে হতোই…

কিন্তু আমায় বশ করে কে ?

আঞ্চলিক প্রেম—তার পথঘাট

আঞ্চলিক প্রেম, তার পথঘাট প্রশস্ত এখনো পুরোনো দিনের মতো
গাড়ি চলে, শস্তায় সুদিন বিক্রি হয়
ক্লাস-ছেড়ে আসা বই জমে থাকে স্মৃতির গুদামে
এখনো সকলে আছে ঠিকঠাক বারান্দায় ব'সে
যেন জলে, বয়সে পা ভেজা…
আর তুমি ? ভিতরে-ভিতরে পুষে নীল এক ক্লান্ত বনভূমি
একেবারে বদলে গেছো,
নাকি সব সাষ্টাঙ্গে বদলেছে
আবহ, শহর, সাধ—সবকিছু ?

আমি কী নতুন বাড়ি তুলেছি বাতাসে—দেখে যাও
একবার এসে দেখে যাও
এই কি তোমার প্রেম আঞ্চলিক, ভাড়াটের মতো
বাড়ি ছেড়ে গেলে, তাকে ভুলে যাওয়া ?
শরীর-সর্বস্ব ভয় হৃদয়ের বৃত্তিগুলো ভাঙে, সেভাবে কি
তোমার স্থিরতা হবে মূঢ় শীতের পাতার মতন ?

ইস্টুপিড্

মনে মনে তার অনেক দুঃখ, এমন একটা
কথা ভাবতুম আমরা।
কেউ শেখায় নি ভাবতে
কেউ বলে নি, ঐ যে লোকটাকে দেখছো, ওর
দুঃখের আর অন্ত নেই।

লোকটা কারুর কথায় রা কাড়তো না
নিজে নিজে কথা কইতো ?
তাও না।
তবে ?
লোকটা কথা কইতে শিখেও, কথা ভুলতে পেরেছে···
কঠিন ক্ষমতা ওর।

আমরা ভাবতুম, লোকটা ইস্টুপিড্।
নইলে লম্বা তেঠেঙে একটা গাছের ফটো তুলে, বাঁধিয়ে
তারই সামনে নিত্যদিন বসে থাকে,
হয়তো পুজো-আচ্চাও করে মনে মনে,
অনেক দুঃখ তার, ঐ ইস্টুপিড্ লোকটার—
এমন একটা কথাই শেষপর্যন্ত ভাবতুম আমরা॥

কাকাতুয়া তুমি

কাকাতুয়া তুমি বারান্দা হলে পার
পশম রক্তমাখা
চৈত্র হাওয়ায় চঞ্চল আলপাকা
কাকাতুয়া তুমি, তাই এ-স্বেচ্ছাচার।
পশুশ্রম—ধ্বনিতে ওঠে নি ধ্বনি
দূরদেশী সন্ন্যাস
এ-পৃথিবীময় বাংলাদেশের বাস
কাকাতুয়া তুমি কোন নয়ানের মণি ?
পাহাড় চূড়ায় ছিলো কি তোমার বাসা
দুরূহ চাঁদের মতো
কাকাতুয়া তুমি ফিরে গেলে অন্তত
শুরু হয় ভালোবাসা।
তুমি ছিলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভার
চৈত্রের শুকতারা
মৃতদেহ কবে টের পায় কড়ানাড়া
অন্যূন লোকাচার
কাকাতুয়া তুমি বারান্দা হলে পার ॥

কাছে চাই—

অনন্ত অতীত থেকে কাছে চাই—

শূন্য ঘরে—সাজাই বাসর
মৃত্যুও সেখানে আড়ম্বর
জানালা-দরোজা ফেলি ভেঙে
কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছি এক-ঠেঙে
চাই তাকে চাই বুকে আজ
এখন সমাপ্ত সব কাজ
লক্ষণীয়া, তুমি আদি-দুখে
এসো আজ আমার সম্মুখে।

সুতরাং গাছে পলকে ফিরেছে পাতা
দেয়াল ভেঙে কি দেয়ালই হয়েছে গাঁথা ?
ঘরে ঘরে ওঠে সানন্দ ক্রন্দন
জন্মমৃত্যু পার হলো যুগ-মন···
অমাবস্যার রাতে কি পাথর বড়ো
সমুদ্রে হলো আর্ত জেলেরা জড়ো
মহল্লা-ঘর-বাড়ি পুড়ে তার ছাই
প্রেরণা তখনো মাতৃস্বরূপা দাই।

কে কারে আজ জ্বালিয়ে গিয়েছে পাড়া ছেড়ে
সে জলে একা বাহিরে দেখা তবুও নিলো কেড়ে
মন আমার ধন আমার হৃদয় ভরা বায়ু
শহর-ছাড়া কুয়ায় ঢাকো তোমার পরমায়ু

নতুবা ওরা দেবেই ডাক তোমার কাছে ফিরে না পাক
সকল দেশে দেশে
উড়েও যাবে দূরেও যাবে তলার ফল কুড়িয়ে খাবে
তোমায় ভালোবেসে

নতুন, তুমি নতুন ভালোবাসা
কথার কথা, ভাবের ভূষি ভাষা
ছড়িয়ে দিয়ে মাঠের পাশে চাষা
দাঁড়িয়ে থাকে দাঁড়িয়ে থাকে শুধু

আমার বুকে ঝরছে পাতা যত
সবই কি আর তেমনি কালহত
অনেকে তার সবুজ—কীটে ক্ষত
পড়েই আছে ধুলোর মতো ধূ ধূ।

কাছে চাই—অনন্ত অতীত থেকে কাছে চাই, কাছে
ভেঙে মাঠ, গুঁড়িয়ে স্টেশন—ব্রীজ যতক্ষণ আছে
তোমাকেই কাছে চাই মাংসপিত্ত শ্লেষ্মার শরীরে
তোমাকে নিকটে পেলে নিজেকেও পাবো আমি ফিরে
কাছে চাই—এই প্রাণ যতক্ষণ আছে তারও পরে
নির্বেদ ও পারময় দেশের সন্তপ্ত কোনো ঘরে
তোমাকেই কাছে চাই পৃথিবীর চেতনার মতো
বারংবার—শৈত্যমাখা আলোছায়া উভয়ে সন্নত ॥

বিদায়বেলা

বিদায় নেবার আগে বলে গেলে ভুলব না ভুলব না দেখে নিও
ভুলব না তুমি ভুলে যাবে
তোমার মনের মতো কবে আর কিবা দিয়েছিলাম
মনের মতন করে থাকাও হয় নি কোনোদিন
বৃষ্টিতে রিক্‌শায় বসে জনারণ্য থেকে কোনোদিন পিছিয়ে হয় নি যাওয়া
নির্জনভুবন পার্কে মাঠে মাঠে রেস্তোরাঁয়, তবে
ভোলার যথেষ্ট রইল সুবিধাই, ভোলাই সহজ।
এমন কী করে গেছি ভুলবে না
এমন কী বুনে গেছি তুলবে না
এমন কী তুলে গেছি ভুলবে না
বিদায় নেবার আগে বলে যায় ভুলব না ভুলব না ভুলব না
দেখে নিও তুমি ভুলে যাবে।
স্টেশন আমার বড় ভালো লাগে
পাখি ভালো লাগে
অবিরাম ময়না নয় অবিরাম কাকাতুয়া নয়
আমার সামান্য ঘুঘু পাখিটিকে বড়ো বেশ লাগে
ঘুঘু বেশ, ঘুঘু বেশ ঘুঘুঘুঘু শব্দে কতো যুদ্ধের বিমান পড়ে
মনে পড়ে তোমাদের কালোচুলে বেদনায় ঢাকা সোনার আপেলগুলি
মনে পড়ে
মনে মনে পড়ে সেদিন একাকী অঙ্গে তুলে নিয়ে কাপড় কিশোরী—
বাবার লিখিত-চিঠি মাকে তার
মনে মনে পড়ে কবিতার লেখকই লিখিত-কবিতা একদিন
নিয়মিতভাবে কতো মনে মন ঝরে ঝরে যায়
আশ্বিনের পার্ক থেকে নীলাভ আকাশ গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ আর
মাঠের ঘাসের, পরে ঝিঁঝিদের ওড়াউড়ি দেখে ভিড় করে
নগরের কলকাতার তৃষিত কল্পনাপ্রবণতা।
তুমি কার মন্থরতা
তুমি কার দ্রুততর গতি

তুমি কার বাঁধনের অঙ্গীভূত ধর্ম-অধিকার
তুমি কার মন্থরতা, তুমি কার, তুমি কার, তুমি কার, তু-মি কা-র ?
এভাবে চীৎকার করছে মানুষের থেকে ন্যূনতম মেয়েমানুষেও
চীৎকারে সঙ্গীতে শিল্পে ভরে তুলছে অধিকার-বোধ
ন্যায্য ও অন্যায্যভাবে কূটতর্ক করছে তাপতমসার আকাশের বাতাসের
স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে

তোমায় আজিকে তার হতে হবে
কিছুটা বাবার প্রতি হতে হবে
কিছুটা পল্লীর প্রতি হতে হবে
কিছুটা পাঠশালার প্রতি হতে হবে
কিছুটা কংগ্রেসের প্রতি হতে হবে
কিছুটা কম্যুনিস্টের প্রতি হতে হবে
এভাবে অনেক হওয়া জড়ো করে তার থেকে সুদে
আমানতী কারবার ফাঁদা
তবিল তছরূপ করে বেজে উঠবে বিদায় বিদায়
একদিন পৃথিবীর সব বোঝা একই সঙ্গে বেজে উঠবে বিদায় বিদায়
একদিন পৃথিবীর প্রিয় প্রিয় নারীদের ছেড়ে যাবে নরেরা সবাই
আধাআধি হয়ে যাবে মানুষের থেকে তার অতিবড় প্রিয় মেয়েমানুষ
দুবার ঘুরিয়ে বলা, দুবার ঘুরিয়ে শোনা ঘুচে যাবে, তবে
কী ভাবে বিকাল হবে ?   যতো ভাবে বিকাল হতেন
তাদের আভাসময় রক্ত লেগে থাকা কপালের স্থচনার বিষণ্ণতা
ঢেকে রেখে বুকে
কোনোদিন কোনো বৃদ্ধ বসিবে কি বারান্দায় আলোয়ান গায়ে
গল্পের প্রস্তুতসভা তামাকের গন্ধে যাবে পেকে
নাতিনির কোলে নীল খোকাপুতুলের ঘুম এসে যাবে বিকালবেলায়
হেমন্তের শিশিরের মতো চুপচাপ কল্পনায়
পৃথিবীর জন্ম থেকে টের পাওয়া সুখ নয়, সব অননুভূত
সুখের কেশরগুয়াগন্ধগুলি মিশে ভরে আছে।
বিদায় নেবার প্রতি লোভ রেখে সকলেই আছে
অন্তঃকরণের কাছে বিদায় নেবার দেখা নাই

এভাবে পালাতে জানে চোর ও সন্ন্যাসী স্বস্তিহীন
আড়ম্বরভরা ঐ বিদায় জানাও বারংবার।

ঝুলনের মেলা দেখে সেবার ফিরছিলাম সাতজন, ছজন হারিয়ে গেল
পথে পথে মাধবীলতায়

ছজন হারিয়ে গেল অতি পরিচিত ছয়জন
ছিটের জামার নাম ধরে আমি ডাকলাম অনেক
মুখচ্ছবি ধরে আমি ডাকলাম হাজার বছর
প্রচুর কোঁচার খুঁট ধরে ঐ হারিয়ে যাওয়া থেকে ফেরাতে চাইলাম আমি
ফিরল না, বলল হারিয়েছি, খুঁজছে, ওরা আমাকেই ডাকছে নানা করে
দুই ধরনের দুই বিদায় সঙ্গত বলে ভেবে মনে হয়
সাত ধরনের সাত বিদায়ে ছিলাম নাতো ভরে ?

তোমাকে আমাদের ঐ ঝুলনের মেলায় নিয়ে যাবো একদিন
যেভাবে আমরা রাঙাপায়ে ধরে জবাব বন্ধন
নিতে ইচ্ছা করি, ধর্মে মরো-মরো যেভাবে আমরা
তোমাকে আমাদের ঐ ঝুলনের মেলায় নিয়ে যাবো একদিন—
দেখো, মাধবীলতাকে তুমি চেনোনাক', বোঝোনাক' তুমি
বিদায়ী মাধবী ও যে !
সকলে বিদায়ীভাবে পররূপে পরতন্ত্রশীল জীবনে ধমকহীন
সাশ্রু বিদায়ের কথা বলি
বহুবার বলা হলে কোনো কথা কবিতার মতো অব্যক্তই থেকে যায় ঠিক
বিদায়ের কথা এসে বলে দেন ভগবান প্রাণে ॥

দূরে ঐ যে বাড়িটা

দূরে, ঐ যে বাড়িটা দেখছো
এক সময় ওখানে বহুদিন ছিলুম, ছোটো
মশারির ভেতরে ছোটো ছোটো হাত-পা
সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার বাইরে ঐ
আপন মশারির ভেতর দূরে ঐ যে বাড়িটা দেখছো
এক সময় ওখানে বহুদিন ছিলুম।

আজ এখানে আছি।
সুখ-দুঃখ ব্যথা বেদনার ভেতর
কিন্তু আমার মশারির বাইরে—

খারাপ নেই। আগেও ঠিক যেমনটি ছিলুম
আজো তেমন।
গা গত্তি ভরে শ্যাওলা, ছোটো
হাত-পা বড়ো কিন্তু কাঁকালসার।
যাবার আগে বোঝা হালকা রাখাই রীতি,
নইলে যে বাহকদেরই কষ্ট॥

মানুষের গল্প

ঘূর্ণিঘাটে জল এলোমেলো
অসংখ্য পাথর তারই সঙ্গে নাচে
হয়ে ওঠে জল
কিংবা টুকরো টুকরো মাছ
নুড়ি হয়ে তার বিশৃঙ্খল···
ঘোরাফেরা
এসবই মানুষ যেন, স্মৃতি তার, কখনো সংবিৎ
ঘর-বার ক'রেও বিরহে
সমাজশৃঙ্খলা মেনে ভালোবাসে নুড়ি ও পাথর
এমনি কি গল্প নয় মাছেদের মনে ?
মানুষের গল্প নয় মাছেদের মনে ?

কার জন্য এসেছেন ?

অদ্ভুত ঈশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন মৃন্ময় উঠোনে
একদিকে শিউলির স্তূপ,
অন্যদিকে দ্বাররুদ্ধ প্রাণ
কার জন্য এসেছেন—
কেউ কি তা স্পষ্ট করে জানে ?
ঈশ্বর গাইছেন গান, তাঁর পথশ্রমে ক্লান্ত ধুলো
লেগে আছে দুটি পায়,
তবু তা স্পন্দিত হলো নাচে
কয়েকটি চিট্‌কেনা ছোটে
চেতনার আনাচে-কানাচে
একটু গেলে, শিমুলের তুলো···

ঈশ্বর কাঁদছেন একা,

সভায় যে কাঁদে সে সংসদে

মানুষের শুভ পণ্য বিক্রি ক'রে দেশবন্ধু সাজে

বন্যার আখুটে বালি সভ্যতাগঠনে লাগে কাজে

এই বলে যে ভাষায়,

সে কখনো ঈশ্বর ছাখে নি !

আমার ঈশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন সবার উঠোনে

একদিকে শিউলির স্তূপ, অন্যদিকে দ্বাররুদ্ধ প্রাণ

কার জন্যে এসেছেন—

কেউ কি তা স্পষ্ট ক'রে জানে ?

আমাদের সম্পর্ক

ঈশ্বর থাকেন জলে

তাঁর জন্য বাগানে পুকুর

আমাকে একদিন কাটতে হবে

আমি একা…

ঈশ্বর থাকুন কাছে, এই চাই—জলেই থাকুন !

জলের শান্তিটি তাঁর চাই, আমি, এমনই বুঝেছি

কাছাকাছি থাকলে শুনি মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন

সম্পর্ক রাখাই দায়

তিনি তো মানুষ নন !

তাছাড়াও, দূরের বাগানে

—থাকলে, শূন্য দূরত্বও

আমাদের সম্পর্ক বাঁচাবে ॥

শুধু বেঁচে থাকে

মাঝে মাঝে, প্রবীণ লম্পট এদিকে ঔদাস্যে চায়
শস্তা ক'রে দিতে পারে সবই—
পরিশ্রম, দৈনিক বহর
একটি কামড়ে পারে রসালো মাংসের সার নিতে
যা লাগে নক্ষত্র-বর্ষ সাধারণ্যে,
আনাড়ি অবুঝে

ক্ষিপ্র পথে যায় কেউ
অধিকাংশ আলস্য-কাতর
তাই, শুয়ে-বসে থাকে মনোভঙ্গি নবাবের মতো
প্রগতি-বিমুখ
ফুৎকার এড়িয়ে শুধু বেঁচে থাকে, ভোট দিতে থাকে!

তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল

আমার হাতের উপর ভারি হ'য়ে বসেছে প্রেত
ফুটপাতে শব্দ হয় ক্রমাগত
বৃষ্টির মুখ-ঝোঁকা মেঘ দূরে সরিয়ে দিলো হাওয়া
আমরা বিকেলবেলা চাঁদ দেখেছিলাম
তরমুজের লাল কাটা ফলার মতন ধরণী-সবুজ চাঁদ

পৃথিবীতে যতো কঠিন সমস্যা ছিলো সব চাঁদের নিচে জড়ো হ'য়ে তবো
কঠিন ছিলো না আর
চাঁদের মতন কোমল, পাংশু ছিলো জীবন আমাদের—জীবনাকাঙ্ক্ষা
পৃথিবীতে বদনা-গাড়ু পরিষ্কার ছিলো সোনার মতন

সোনার মতন মুসলমান নেমে গিয়েছিলো ওজু করতে
ওদের আল্লা করাতে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছে কাল
তার কাশফুল উড়ছিলো হাওয়ায় —তার কানের পৈতা হয়েছিলো
নির্ঘাত কুটি কুটি

কুশাসনে বসতে আমার ভালো লাগে না
ভালো লাগে না আমার ইন্দ্রজাল—মোহরের গল্প
আলিবাবা ভালো লাগে না আমার
ভালো লাগে না আমার সাধারণতন্ত্র—দেহ-বিক্রি
আমেরিকার কোনো কিছুই ভালো লাগে না আমার—
কেনেডির মৃত্যুই আমার ভালো লেগেছিল।

আকাশমণির মাথায় হাওয়া লাগছে
ফুল-বেলপাতা সমস্ত আমার হাত থেকে পড়ে গেলো
ডাকছে তক্ষক—শিবের ধিঙ্গি লিঙ্গ করছে খাঁ খাঁ
মাঠ ভেঙে রোদ্দুর এসে পড়ছে গায়ে তার
দেবতার সবই আছে—ছাতা নেই—নেই ওয়াটার-প্রুফ
বৃষ্টির বিরুদ্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায়
দেবতাদের দেশে ইংরেজি নেই—হিন্দী নেই
নেই ভাষা কোনো আর
ইংগিতে ইংগিতে বাংলাদেশের মতন কথা আছে তার
আছে যোগাযোগ—আছে কলংকের কাল—
আছে চলাফেরা
দেবতাদের দেশে ইংরেজি নেই—হিন্দী নেই
আছে লরির আওয়াজ, মুক্তি-যুদ্ধ
আছে গড়নির্ণয় দেয়াল-ঘড়ি
আছে সবই যাকে তোমরা বলো 'অ্যাসেট্'।

মৃত্যুর অনেক আগে জন্মেছি আমরা—
জন্ম আগে—মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ,
পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের

সেখানে মাইল-পোস্ট নেই—নেই টেলিফোন-তার
মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ—
পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের
তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল
আছে কুলুঙ্গি, দেয়ালগিরি
আছে আসবাব উপঢৌকন মেহগনি-খাট পাশবালিশ
আছে পিকদানি পানের বরজ কাবুলী কলাগাছ
আছে ঘেটো রুই হাতছানি শ্যাওলা দাম
আছে প্রকৃত পিছিয়ে-যাওয়া শিশু ভোলানাথ শ্মশানের ছাই

তুমি না দিলে, আমার নয় কিছুই
কেননা, তোমায় আমি বিবাহ করেছি—
তোমার খেয়েছি লালা, কেটেছি পকেট—বগলের খাঁজে
উপুড় ক'রে দিয়েছি পাউডার-কৌটো
তোমাকে ভালোবেসেছি ভালোবেসেছি
যেমন করে কুকুর ভালোবাসে যেমন করে মশারির গর্তে গর্তে মশা বসে যায়
মৌমাছির মতন মাংসাশী
পৃথিবীতে বাঁচার কোনো প্রয়োজন ছিলো না—
বৈতরণী পার হ'য়ে তারাপীঠ যেতে হয়
আমাদের এঞ্জিন আমাদের লাল-হলুদে-মেশা বগিগুলো ফেলে গিয়েছিলো
পথেই।

শান্তিতে কিছুদিন বিদেশে থাকা চলে—দেশের অদ্ভুত
গোলযোগ বিড়ম্বনা ভালো লাগে আমাদের চিরদিনই
গাধা ভালো লাগে, ভালো লাগে র‍্যাদার উপর কাঠ-বরফের কুঁচি
পরিপ্রাণহীন খাটা পায়খানা ভালো লাগে আমাদেরও—
আমাদের দেশের যা কিছু আছে—পেঁপে গাছ
ভালো লাগে আমাদের—আমরা সুখী!

['তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল' অক্ষর কটির পিছনে যেন এমন অর্ধসত্য রাখা যেখানে ভিত হারা দেয়ালের স্থাপনও সম্ভব। পদ্যটির কাটা-

ছেঁড়া শরীর-ব্যাপী তিতিবিরক্ত ভাব আছে, তা লেখকের তৎকালীন মানসিক অবস্থার পরিচায়ক। অহোরাত্র বহ্নিসেবনের পর সকালে কম্পিত আঙুলে ততোধিক দাঁড়িকমাহীন একটানা চলচ্ছবি—অর্থ অনর্থের মাঝামাঝি। ধর্ম-মূলক দাঙ্গার প্রতি ঘৃণাও আছে। ইতস্তত গ্রামের ইতস্তত ছবি লেখকের বাল্যস্মৃতি চব্বিশ পরগনার দ্বাদশ দেউল, চলনবিল, বামুন-পুকুর, মুসলমান পাড়া, রেলইস্টিশান, মৌচাক প্রভৃতির—সর্বোপরি, অতীত আর অস্তিত্বের মুহুর্মুহু গোলযোগ আর কোলাহলের উপর দাঁড়িয়ে আছে এক বিহ্বল আর অর্ধসচেতন মূর্তি যা তোমার, নারীর চিরন্তন অভিপ্রায়-মাখা!]

যদি কিছুদিন

রঙিন মাছের দুঃখকষ্ট শুধু ধুয়ে যায় জলে
সুখ পড়ে থাকে, ভাসে স্নেহজাত পদার্থের মতো
জলের উপরে, মধ্যে—নিচে চেপে পাঁকের ভিতরে
সর্বত্র সাঁতার কাটে—বাধাহীন নিত্যবিঘ্নহীন।
রূপোলি সোনালি মাছ নীল মাছ জলের পিচ্ছিল
পরিচয় দিতে যদি উঠে আসে গেরস্তের ঘরে
বিজলীর আলো পায়, পায় সযতন ধরা-জল
শিশুদের হাসিকান্না শুনে ভাবে মানুষের মতো
মাতা-পিতা হয়ে যদি বাঁচা যেতো ঘরে ও বাহিরে
চমৎকার পোশাকের আদিখ্যেতা দেখিয়ে সমাজে
মানুষের মতো যদি ত্বরা ও আলস্যভরা কাজে
কিছুদিন বাঁচা যেতো, ভালো হতো, ভালো কি হতো না?

অনেকদিনের পুরোনো মুখ

একটুখানি বৃষ্টি এবং একটুখানি আলোয়
অনেকদিনের পুরোনো মুখ আজকে দেখায় ভালো
একটু বা তার গন্ধ এবং একটু ধুলোবালি
আতুলবাতুল সব ঝেঁটিয়ে ভিড় করেছে খালি
ভিড় করেছে ভিড় করেছে একাই হাজার হয়ে
সেদিন কথা কয় নি এমন মেঘ এনেছে বয়ে
আকাশখানা টুকরো এবং চাঁদ কেন বুক ভাঙা ?
বাড়ির ভিতর একটি বাড়ির তুচ্ছ ভুবনডাঙার—
একটুখানি বৃষ্টি এবং একটুখানি আলোয়
অনেকদিনের পুরোনো মুখ আজকে দেখায় ভালো ॥

হারাতে হারাতে তাকে

আমার শিকড় নেই, ডালপালা নেই, পাতা নেই
মাংসে ঘোর দুঃখ আর হাড়ে আছে বাতাস বহতা
আমার বাগান নেই, মাটি নেই, মাতৃভূমি নেই
আমার স্বপ্নের মধ্যে ওড়ে শুধু ধুলো ও পাথর।

এই আমি, পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একজনই
যার সব ছিল, যার সব গেছে—অকস্মাৎ নয়
ধীরে ধীরে গেছে, গেছে থেমে-থেমে, একটি-একটি ক'রে।

তা নিয়ে প্রকৃত কিছু বলার দরকার যেন নেই
তা নিয়ে কারুকে কিছু বলার দরকারও যেন নেই
অভিযোগ নেই, আছে হারাতে-হারাতে তাকে পাওয়া !

জন্মে থেকেই মাটির ওপর

জন্মে থেকেই মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়তো
ফাটতো মাথা ছিঁড়তো হাতা জামার
উঁচুয় উঠে ভয় পেতো সে নামার
নামতে গিয়ে বন্ধ চোখে হোঁচট খেয়ে পড়তো।

এমনি ক'রেই ভাঙতে-ভাঙতে ভাঙতে-ভাঙতে কবে
দিন ফুরোলে সন্ধ্যা যখন হবে
একাকী এক গাছ ছিলো, তার মাথার ওপর চড়তো।

এছাড়া তার কাজ ছিলো না কোনো
খানিক চোখের দেখা এবং খানিকটা দুঃস্বপ্ন
বাগান পুকুর উঠোন জুড়ে গেরস্থালি গড়তো।

কিন্তু, সে তো জন্মে থেকেই মাটির ওপর পড়ছে
বস্তু থেকে নিচ্ছে বিকাশ, আর কিছুটা গড়ছে
মনের মতন বনের মতন—যেমন লোহায় মরচে
এবং সে তো জন্মে থেকেই মাটির ওপর পড়ছে॥

যে যায় সে দীর্ঘ যায়

একজন দীর্ঘ লোক সামনে থেকে চলে গেলো দূরে—
দিগন্তের দিকে মুখ, পিছনে প্রসিদ্ধ বটচ্ছায়া
কে জানে কোথায় যাবে—কোথা থেকে এসেছে দৈবাৎ-ই
এসেছে বলেই গেলো, না এলে যেতো না দূরে আজ!

সমস্ত মানুষ, শুধু আসে বলে, যেতে চায় ফিরে।
মানুষের মধ্যে আলো, মানুষেরই ভূমধ্য তিমিরে
লুকোতে চেয়েছে বলে আরো দীপ্যমান হয়ে ওঠে—
আশা দেয়, ভাষা দেয়, অধিকন্তু, স্বপ্ন দেয় ঘোর।

যে যায় সে দীর্ঘ যায়, থাকা মানে সীমাবদ্ধ থাকা।
একটি উদাত্ত মাঠে, শিকড়ে কি বসেছে মানুষ-ই?
তখন নিশ্চিতই একা, তার থাকা—তার বর্তমানে,
স্বপ্নহীন, ঘুমহীন—ধুলা ধুম তাকে নাহি টানে।
একজন দীর্ঘলোক সামনে থেকে চলে গেলো দূরে—
এভাবেই যেতে হয়, যেতে পারে মানুষ, মহিষ।

কী সুখ, গভীর দুঃখে

দূরে যায়, কখনো থাকে না কারো কাছে
স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ দোলপূর্ণিমার রাত্রে-ভাসা দেহ
কখনো থাকে না কাছে, দূরে যায়, দূরে চলে যায়···
দুয়ারে রঙিন খিল পিছনের ওষ্ঠাধর বন্ধ করে আছে।

দেয়ালে লেগেছে রঙ, ধুলো কাদা হয়েছে নরম
কে যেন কৌতুকভরে গারদে নিক্ষেপ করে গাধা
তৎক্ষণাৎ হয়ে যায় জেব্রা—ঐ বনের সন্ততি···
তোমারও শরীর যেন রেখা ও বর্ণিকাভঙ্গে গাঢ়।

ওষ্ঠের সমস্ত রস, প্রাণের প্রখর খরতাপ
আমার ভিতরে এসে ঘোরতর আন্দোলন করে
দাঁতে দাঁত লেগে যেন রক্ত পড়ে অমল সুধার
কী সুখ গভীর দুঃখে একটি দীর্ঘদিন কেটেছিলো ॥

চাঁদ, তুমি থেকো

চাঁদ চলে লুটিয়ে কাপড়
কোথাও লাগে না জল, ধুলো কিংবা ধোয়া ও চোরকাঁটা
আবশ্যক শুকনো থাকে, পরিচ্ছন্ন থাকে
কেবল মেঘেরা তাকে তৃণাঞ্চলে ঢাকে
যেন তালি-তাপ্পি দেওয়া গরীবের কানি!

আমি জানি
তুমিও চাঁদের মতো বহুদূর থেকে
আলুথালু কাপড়ের বশবর্তী নও।

সে-কাপড়ে লেগে যায়, ধুলোবালি চোরকাঁটা সবই
তুমি ঠিক চাঁদ নও, চাঁদের মতনও নও কিছু।
ভালোবাসা থেকে তুমি বহুদূর, বহুদূরে, নিচু
সেখানে একাকী তুমি থেকো চিরদিন—
এই-ই চাই॥

তাঁকে

কখনো সমুদ্রে তাঁকে করেছি সন্ধান
কখনো পাথরে
কখনো হেমন্তে শান্ত মানসিক ঝড়ে
বৃষ্টিতে খরায় ফুলে শিকড়ে কখনো
কে যেন বলেছে : দেখো, শোনো—
কিছুই বলো না তুমি এক পা বাড়িয়ে
যে যেখানে আছে থাক্, শিকড় নাড়িয়ে
তোলার সরল কাজ তোমার তো নয়।
তুমি শুধু করে যাবে প্রবৃত্তি সঞ্চয়
আর বাকি
তোমাকে যা ছোঁবে না, তা ফাঁকি।
কখনো সমুদ্রে তাঁকে করেছি সন্ধান
কখনো পাথরে
কখনো হেমন্তে শান্ত মানসিক ঝড়ে॥

তোমাকে

ইচ্ছে, তোমার ইচ্ছে হলেই শুনি
ফুল ফোটাতে অজস্র ফাল্গুনে
এবং তোমার ইচ্ছে যাবার নয়।

বৃদ্ধ, তোমার বয়সে ছারখার
বাংলাদেশের নম্র সোনার হার—
তুচ্ছ বিষয়ে তাৎক্ষণিকের ঘরে
প্রণাম তোমার তাইতো এসেই পড়ে

দেহ তোমার কী করে ঘুণপোকায়
কাটছে? এবং কোন্ সাহসে খোকা
বলছে, দেখায় ভুল আছে ভুল আছে!

জ্যেষ্ঠ, তোমার তাই পেয়েছি ক্ষমা
বুকের মধ্যে নিত্য আগুন-জমায়
উঠছে ধোঁয়া, তার মানে কুয়াশায়—
ভুল করেছে আমার ভালোবাসা॥

জীবনের ছদিকে

স্থির ও স্বচ্ছন্দ টান জীবনের ছদিকেই আছে—
ছদিকেই যেতে হয়, বহুদিকে ; কিন্তু প্রধানত
শূন্য ও পাতালে থাকে রেশারেশি, মর্তের মানুষ
ও-ছুটি অব্যর্থ দিক ভোগ করে ; নষ্ট হয়, বাঁচে
এবং কপালে পথ বন্ধ হ'লে পা করে পৃথক
আন্দোলন যেতে চায়—কখনো সাফল্য আমি দেখি
আর দেখি ফিরে-আসা, মূঢ় মুখ ; বিবর্ণ পাঁচিল
ঘিরেছে নতুন বাড়ি, অনিবার্য কপালে কেতকী···

এইভাবে, জীবনের নিযুক্ত পথের মধ্যে যাবে
একজন ভেঙে দিতে খোড়োঘর, নিঃসঙ্গ বাগান
অন্য বিচক্ষণ, বলবে ; ওকে এনে হৃদয়ে বসাও
এবং চক্কর দাও মানসিক, স্বপ্নের জৌলুশে
ওকে জব্দ করো তুমি, কাছে রাখো,
অধিকন্তু, কাছে—
স্থির ও স্বচ্ছন্দ টান জীবনের ছদিকেই আছে ॥

কাগজের নৌকা

এ-বয়সে একবার দুঃখের ভিতরে গিয়ে
দাঁড়াবার ইচ্ছা হয় মনে
কথা তারও কিছু আছে—আমাকে গোপনে
জানাবার, ভুলে গেছি পথে হেঁটে, বিছানায় ঘুমিয়ে
কথা তার ছিলো কিছু, বলেছিলো একদিন যখন
আমার শরীরে-মনে ছিটেফোঁটা কাপাস ছিলো না।
এখনো তেমন কিছু গায়ে নেই লাগে না বৃষ্টির
আদর, রোদ্দুর রাগ ; ছায়া এসে ছোঁয় না সন্দেহে
এ-মূর্তি মানুষ নাকি ? মায়া নাকি ? মতিভ্রম নাকি ?

নিজেরও সন্দেহ হয়—মৌন হিম জলের ভিতরে
আসমুদ্রহিমাচল দেখেও সন্দেহ জাগে ঘোর
হয়তো মানুষ নয়, অন্য কিছু, অন্যতম কিছু···
দুঃখের অগ্নির মধ্যে কাগজের নৌকা ভেসে যায়॥

সকলের চেয়ে বেশী অহংকার নিয়ে

কেউ কি প্রকৃত ঠিক করে দিয়েছিলো ?
নাকি বাহুবলে তাকে বাগানের ভ্রূ-মধ্যে রেখেছি
এবং নিশ্চিন্ত আছি, কিছুদিন—জানি দাঁড়াবে না
পা দিয়ে চৌকাঠে যেন বলবে না, এখন তোমার
বাগানে যাবার পালা—কিছুদিন গাছ হয়ে থাকো
শিকড় যেখানে যায়, তুমি যাও—গিয়ে দেখে এসো
ঘেঁষ বালি চুন ক্ষার—মানুষের মহিমার চেয়ে
এদের দাবিও কিছু অল্প নয়, সামান্যও নয়।
ঘরে তাই জামা পরে বসে আছে করবী কাঞ্চন

এক পাটি জুতো পায়ে সুপারি দাবায় একা খেলে
লেবুর কাঁটায় কাঁথা, মলিদা নিয়েছে ক্ষিপ্র জুঁই
অলস গোলাপ বেলি শুয়ে আছে মাথার বালিশে—
ঘর ভরে গেছে মাংসে—সবুজ হলুদ নম্র নীল

সকলের চেয়ে বেশী অহংকার নিয়ে একা আছি ॥

সেই দুটি হাত ছোটে

মনুমেনটের নিচে, অন্ধকারে ক্রুদ্ধ বাংলাভাষা…
হিংস্র দুটি হাত ঘোরে মানুষের কণ্ঠ পাবে ব'লে
অন্ধকারে, হিংসাদ্বেষ হত্যাপরায়ণ সেই হাত
একদিন ছিলো ছোটো, একদিন সংশ্লিষ্ট মায়ের
বুকের ওপর থাকতো, আকুল মুখের ফুটো, বোঁটা
প্রাণপণ টেনে ধরতো…সেই মুখে হিংসা স্রোতোস্বান
সেই দুট হাত ছোটে সহোদর কণ্ঠের উদ্দেশে
অন্ধকারে, দুপুরে রোদ্দুরে…কেন অন্ধ নয় জনকজননী ?
কেন নয় বধির, জরদগব, লুলা কিংবা পাথর নেশায়
মহাত্মা ও মতিচ্ছন্ন !   কেন নয় অজাতক, বিষে
কেন নীল নয় ঐ সাগরের ক্ষিপ্তির মতন
উপরে উৎকণ্ঠা রেখে অন্তরে নিস্পৃহ, স্পর্শহীন ?
মনুমেনটের নিচে, শহরে-সংগ্রামে ঘরে-ঘরে
আজ বাংলাদেশ জুড়ে ভোজসভা ভেঙে ছোটে হাত…

স্তব্ধ বেল্‌সেজার রাজা জনগণশূন্য বাংলাদেশে ॥

ঝর্না শুধু যাবে বলে

ভিতরে আছে কি কেউ ? রক্তের ভিতরে কেউ আছে ?
মনে হয় ঘুমঘোরে তাকে দেখে চেনাও সম্ভব
জেগে কখনোই নয়, সচেতনভাবে যেন নয়
তাকে পেতে গেলে দীর্ঘ ঘুম চাই, হিম মৃত্যু চাই
রক্তের ভিতরে আছে, রক্তের ভিতরে কেউ আছে
নিশ্চিত, জেগেই আছে, সতর্ক প্রহরী হয়ে আছে
মহাল পৃথক রেখে জেগে আছে ভবিষ্যৎভরা
মানুষের দেহ থেকে রক্ত যেন স্বতন্ত্র, স্বাধীন।
অথচ কী ভাবে হবে ? ব্যবচ্ছেদ, কোন্ ভাবে হবে ?
ঝর্নার সজল পৈতে ছেঁড়া যায় গা থেকে তোমার
পাহাড়—জঙ্গলময় উত্তেজক অন্ধকার নিয়ে
এখনো একাকী থাকো, পাহাড়, একাকী থাকো কেন ?
তোমার ভিতরে যেন রক্ত নেই, পারম্পর্য নেই
ঝর্না শুধু যাবে বলে তোমার ভিতরে মুখ তোলে ॥

তুমি তারই পূজা আজ নেবে

নিতান্ত শৈশবে আমি হারিয়েছি নিজস্ব পিতাকে
অনুপস্থিতি তাঁকে জন্মাবধি আড়ালে রেখেছে
প্রকৃত দেখিনি তাঁকে, কোনোমতে স্মৃতির তন্তুর
জাল বুনে ছবি আঁকি শোকহীন, যোগাযোগহীন।
তেমনই তোমার, মৃত্যু দেখে আমি গ্রাম্য সিনেমায়
অকস্মাৎ ব্যথা পাই অতিদূর সুদূর শৈশবে
খাঁ খাঁ মাঠে-ঘাটে কাটে স্বজনবিহীন ছেলেবেলা…
তোমার কবিতা খুলে স্তব্ধ বসে নিষ্পাপ কিশোর
একদিন, বৃষ্টি পড়ে গ্রাম ভেঙে গাছপালা ভেঙে

আবার সহাস্য দিন ফিরে আসে আবর্তে সহজ
তেমন হয় না ফেরা তোমাদের, হতে পারে নাকি—
কোনোদিন অন্ধকারে, কোনোদিন গভীর আলোয় ?

ইচ্ছে হতো একদিন চুরি করে ভাষার বাগানে
ঢুকে পড়ে ফুল তুলি, যে ফুলে তোমারই পূজা হবে
কিন্তু ভয়ে ভয়ে তার পাশ দিয়ে গেছি প্রতিদিনই
অথচ তোমার দয়া সুখেদুঃখে সম্পদে-বিপদে
আমায় করেছে ঋণী, শুধুমাত্র করতলগত
এবং তোমার গানে আমি নিই সহজ নিশ্বাস
মুহ্যমান প্রাণ পায় গান তার শ্রবণে পৌঁছালে।

আজ বাংলাদেশে হবে অধিকন্তু স্মৃতির সম্মানে
সভা ও স্মরণকার্য, মানুষের দায়িত্ববোধের
স্বভাববিরোধী এই ধ্যান তাকে রক্তের সমুদ্র
পার করে দেবে বলে করতলে স্থাপন করেছে
শ্বেতশুভ্র কিছু ফুল, সহোদর রক্ত সেই হাত
লুকিয়ে মানুষই পারে শোকতপ্ত হতে বারংবার
এবং রবীন্দ্রনাথ, তুমি তারই পূজা আজ নেবে ?

ছায়ার অস্তিত্ব

আমার একটি বৃহৎ ছায়ায় বিপন্ন অস্তিত্ব দেখে
অনেক শিক্ষা ছিলো নেবার। নিলাম নাকি ?
জীবনের সব ধুলা-সোনায় একভাবে জড়িয়ে থাকি…
মর্কটে তো অনেক শেখে !
শিক্ষাদাতা, তোমার কাছে একটি গোপন নিবেদনের
প্রকৃষ্ট ফাঁক, তুমিই জানো—তোমার কাছে হার মেনেছি
কয়েকটি দিন স্বেচ্ছা-বাঁচার কিংবা খাঁচার শিক্ ভাঙনে
এমন কি দৌরাত্ম্য আছে ?
সব জেনেছি…
ভীষণ ভয়াল একক হওয়া, জিউলি-আঠার জনসভায়
যখন তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে, প্রবল উরুর
মধ্যিখানের চড়-চাপড়ে উথ্‌লে উঠতো গুরু-গুরু
সময়, রক্ত, আর পিছুটান…
মৃত্যু কিন্তু মনোলোভাই !

স্থির স্বাধীনতা

আমার গঙ্গার জলে নির্বিরোধ জাহাজের পাশে
সিন্ধুশকুনের দল খেলা করে, বয়ার উপরে
উঠে পাখা মেলে তার দেহ থেকে ফেলে দেয় জল
তোমার গড়াই নদী একখানি রক্তের কম্বল
বিছিয়ে রেখেছে, তারই মধ্য ফুঁড়ে ভ্রাম্যমাণ শব
ইতিউতি শকুনের ঠোঁট কাড়ে সে ফোলা আসব
এবং কপালজোড়া দুঃখ, ছাই পূর্বদিকে ওড়ে
আমার গঙ্গার জলে নির্বিরোধ জাহাজের পাশে
সিন্ধুশকুনের দল জীবনের ব্রাত্য খেলা জোড়ে।

তোমরাও খেলা করো, মৃত্যু ও জীবন নিয়ে ক্রমে
নয়ানজুলির একপার থেকে অন্যপারে জমে
জন্তুর চেয়েও নষ্ট অজন্তুর গুহার ভিতরে
মুখোমুখি, স্বাধীনতা চাই ব'লে, বাংলা চাই ব'লে
জীর্ণ যুদ্ধে নেমে পড়ো অদূরদর্শিতা···
তবু তার নাম স্বপ্ন, তারই নাম স্থির স্বাধীনতা ॥

তবুও মানুষই পারে

সুন্দর ঘনিষ্ঠ হয়ে একদিনই উঠোনে বসেছে
তুলসীমঞ্চের কাছে, শেফালির স্থগিত শোভায়
পড়োশি আলোর নিচে মর্মন্তুদ জ্যোৎস্নার ভিতরে।
তেমন দেখি নি বসতে তাকে আমি স্বপ্নে কোনদিনই—

ফলে, মনে হয়, বড়ো সুসময় দুয়ারে দাঁড়িয়ে
বাড়ির ভিতর থেকে প্রত্যুদ্‌গমন করবে চাঁদ
অর্থাৎ চাঁদের মতো বিষণ্ণ মানুষ একজনা
সুন্দর, তাকেই বলি অন্ধকারে, দিনের আলোয়।

ভালোবেসে সব কিছু দিতে পারা ছিলো স্বাভাবিক
মানুষ যখন ছিলো সম্পন্ন সমুদ্রে ভাসমান
লঘুপক্ষ পাখি কিংবা ফেনা, মাছ, শুক্তি মনোহীনা—
এখন জীবন বড়ো বিবেচক, দানও কুণ্ঠাময়
তবুও মানুষই পারে একদিন মানুষে ছাড়াতে—

যেতে দূর, ভালোবাসে সিংহ-হিংস্র নির্জন বনানী ॥

সবাই বাহিরে

এখন অনেক রাত—অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছি
কলরব গেছে থেমে—শার্সির উপরে সাদা ছাই
হুহুস্বর বাতাসের কিংবা কোন্ বুদ্ধের সন্ন্যাসী—
বলে মণিপদ্ম ছাড়া জীবনের সার্থকতা নাই!

এখন অনেক রাত—নৈরাশার চেয়ে এই গাঢ়
রাতে বসে আছি ঘরে, বাহিরে সর্বত্র ঢাকে ঘাস
তুষার, মন্ত্রের মতো অবিচ্ছিন্ন আত্মারই সন্ত্রাস
যে-মুক্তি পারি না নিতে, সে-মুক্তি তুমি কি দিতে পারো ?

ফুল ফোটে ভোরবেলা—নক্ষত্র শুকিয়ে যায় বলে
তার প্রতিচ্ছায়া যেন আমার বাগানে জেগে থাকে
তোমরাও জেগে থাকো, ঘুমাতে পারো না নীল কোলে
বনানীর, লুতাতন্তু বাসনা আচ্ছন্ন করে রাখে।

মাঝে মাঝে টের পাই—তোমার অস্তিত্ব দেয় নাড়া
বন্দিনিবাসের দৃঢ় পাঁচিল, পরিধি, দুর্গচূড়
ক্রন্দনে-উল্লাসে-মেশা সে এক বিচিত্র পান্থ-স্বর
'সবাই বাহিরে' বলে সুকৌশলে দিয়েছে পাহারা!

কেউ কি যাবে

কেউ কি যাবে ? কেউ কি চলে যাবে ?

যেভাবে জল জলের মত যায়
যেভাবে ফুল ফুলের দিকে চায়
সেভাবে কেউ নিজেকে ফিরে পাবে !

কেউ কি যাবে ? কেউ কি চলে যাবে ?

ভালো-থাকার ভিতরে ভাঙে ঘর
সর্বনাশ হবে স্বয়ম্বর
অন্ধকার হাঁ করে গিলে খাবে

কেউ কি যাবে ? কেউ কি চলে যাবে ?

সহজ শুধু যাওয়াই, ফিরে আসা
কঠিন, বড়ো কঠিন ভালোবাসা
কঠিন, বড়ো কঠিন ভালোবাসা

কেউ কি যাবে ! কেউ কি চলে যাবে ?

বন্ধ দ্বারে

ফুলগুলো সব দাওয়ায় যেন কপাল খুঁড়ছে
দুয়ার বন্ধ ভিতরে তাই হাওয়ায় উড়ছে
দেয়াল থেকে ঝরে পড়ছে নোনায় তুচ্ছ
বালি এবং চুনের নরম পলেস্তরা।

এমন ছবি ছেলেবেলায় মিষ্টিহাতের
বেতের বাঁধা ধামায় মাখা মসলামুড়ির
সঙ্গে মিশেল রাসের মেলার রঙিন পুচ্ছ
শোলায় গড়া কাকাতুয়ার নেইকো জুড়ি।

হারিয়ে গেছে আমায় ক'রে অন্যমনা
তার কথাটি লিখবে তোমায় আরেকজনা
এখন ভরা রোদের চড়ায় পাথর পুড়ছে
ফুলগুলো সব দাওয়ায় যেন কপাল খুঁড়ছে—

মন্দ কপাল তাই দাঁড়িয়ে বন্ধ দ্বারে ॥

সুন্দরের স্বেচ্ছাচার

সুন্দর সমুদ্রে যেতে ভালোবাসতো
রাতদিন সমুদ্রের পাশে একা, উজ্জ্বল হাওয়ায়
বসে থাকতো যেন এক নিবিড় গোপন আকর্ষণে
ঐ নীল দূরত্বে গভীর কোনো নৌকা দেখা গেলে
কিংবা তার পরে কোনো মানুষের মতন সপ্রাণ—
দেখা গেলে, সুন্দর ফেরাতো মুখ

মানুষ বা মানুষের ব্যবহৃত বস্তুর বিরুদ্ধে
সুন্দরের স্বেচ্ছাচার একদিন এরকমই ছিলো।

আজ সে সুন্দর এসে বসে আছে মানুষের পাশে
সমুদ্রের কাছে থেকে, সমুদ্রের কাছে নয় খুব—এরকম
বসে থেকে ক্রমাগত ভিতরে চলেছে, মানুষেরই
মুখচোখ, মানুষেরই স্থায়ী ঠিকানার
গভীর বসত ঘরে আজ সুন্দরের সিংহাসন
এবং নিশ্চিন্ত সুখে ছোটখাটো দর্পণে মজেছে

সমুদ্র দর্পণ ঐ আকাশের, পাখির, নৌকার॥

স্মৃতিচিত্রশালা

তোমার পূর্বের দেশ বলতে মনে পড়তো নদীনালা—
এই জল, গেরস্থালি ; অন্যপারে সুপারিসংকুল
নীলাঞ্জন ছায়া আর মনে পড়া শান্ত বনফুল
এই সব নিয়ে ঘর ভরে থাকতো স্মৃতিচিত্রশালা
আর আজ ? মনে পড়ে কিংবা মনে প্রকৃত পড়ে না
কার রক্তে নদীজল বহে আনে তিক্ত বনফুল!
স্বাধীনতাহীনতায় বাঁচা নয় ; আগুন, খড়ে না
হৃদয়ে-হৃদয়ে জ্বালো, দারুণ সন্ত্রাসে করা ভুল—
মরো—কিন্তু, মেরে মরো এবং উদ্ধার করো ঘর
নিশ্চিত রয়েছি পাশে, আমি তোর জন্ম-সহোদর॥

পরমেশ্বর তুমি

আমার জিরাফই শুধু লাগে ভালো, তোমারে লাগে না।
স্বপ্নে প্রতিদিন আমি দশ বারো বছরের জিরাফের
অতিরিক্ত কিছুই দেখি নি
ঐ জিরাফের মতো উঁচু গলা থেকে নভোজায়মান চিলের নীলিমা
অপরিবর্তনপ্রিয়, সহচরকরহস্তে ঝর্নাপ্রান্তে ভ্রমণকালীন দেখেছিলাম।
না দেখে ছিলাম তারে কতদিন ?
না-দেখে ছিলাম তারে দশ বারো বছরের
জিরাফের অতিরিক্ত কিছুই দেখি না যবে, কে সে ?
জিরাফের চেয়ে বড়ো হয় ?
নীলিমার চেয়ে সেকি অহরহ ভালোবাসাময়, বড়ো বেদনার ?
পরিস্ফুটনের ?
আত্মগ্লানিভরা সে কি দৈনন্দিন ব্যক্তিরও নিষ্ঠুর ভালোবাসা, রাজনীতি ?
জানি না। বলে না কেউ। সকলের অব্যক্ত গোপন
ঝরে যায় পৃথিবীর আপৎকালীন যক্ষপুরে
মহামহিমার কাছে, তোমাদের কাছে নয় ; ভালোবাসা মানেও হীনতা।
সে খুব বিস্তৃত নয়, জিরাফেরও মতো নয় অতিক্রান্ত উল্লোল নীলিমে,
সে খুবই নূতনভাবে করে গেছে শব্দে প্রাণপাত,
হে পরমেশ্বর, তুমি ধর্মে আছো, জিরাফেও আছো ॥

জল পড়ে

সূর্য যায়, সূর্য ডুবে যায়
তখন দরজায় জল পড়ে
কে যেন ছড়ায়
শাঁখ বাজে ধূপধুনা পোড়ে
কয়েকটি বাদলপোকা কেন যেন ওড়ে ?
ওদিকের মাঠে হাঁটে চাষা
আকাশেও সোনালি বাতাসা
জল পড়ে বুকের ভিতরে
দুরন্ত বাদলপোকা ঘুরে ঘুরে ওড়ে
জল পড়ে, শুধু জল পড়ে ॥

রক্তের দাগ

বিষণ্ণ রক্তের দাগ রেখে গেছে অন্ধকারে ফেলে
মুণ্ডহীন তরুণের উজ্জ্বল বিমূঢ় এক দেহ।
খোলা ছিলো গলির গৃহস্থ জান্‌লা আর
কোষমুক্ত তরবারি ঘাতকের হিংস্র সাংঘাতিক…
একটি জিজ্ঞাসা নেই ওই দৃষ্টিহীন দর্শকের
চোখে বা কণ্ঠেও নেই একটি অস্পষ্ট উচ্চারণ :
কেন এই নিদারুণ হত্যা ?   কেন মায়াহীন ক্রোধ ?
এই বাল্যকালে ওই আমার সন্তান কী করেছে ?
কোন্ অপরাধে এক প্রাণবন্ত জীবন আঁধারে ?
ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, ও শুধু বিপ্লব চেয়ে দোষী।

ঐ গাছ

একটি নিষ্পাপ গাছ আমাদের মাটিতে বসেছে
বাস্তুর নিকটে আছে, বুকভরা মায়ার নিকটে
পিতৃপুরুষের স্নিগ্ধ স্মৃতির মতন কেশপাশ
এলিয়ে রয়েছে ছায়া, সীমাহীন রোদের ভিতরে—
যেন ঠাণ্ডা প্রেম তার কুয়োতলা নিয়ে আছে কাছে
মানুষের অগোছালো শান্তি ও অগ্নির
পারম্পর্য মেনে নিয়ে, প্রকৃত চিন্ময়
রূপ তার, ঐ গাছ আমাদেরই মাটিতে বসেছে ॥

তিনি এসে উঠেছেন

আমি জানি, দিনের সংস্পর্শ তাঁকে চিরদিনই দেবেন বিদায় ··
তিনি এসে উঠেছেন আমাদেরই নিবিড় বাড়িতে
তাঁর জন্য, একটি অস্পষ্ট ধুপ জেলে দেওয়া ভালো, এইখানে
তাঁর জন্য বেঁধে-রাখা একটি হরিণ—ঐ গাছে

হরিণ সম্পর্কে আমি কিছুদিন লেখাপড়া করেছি, বিস্তর···
হরিণ সম্পর্কে আমি কিছুদিন—গণ্ডগ্রামে ঘুরে
চাষীদের, হরিণের ঘাস খাওয়া এবং না-খাওয়া
দেখেছি যথেষ্ট আমি···তার মানে, এই লক্ষ্যহীন
ভালোবাসাবাসি থেকে পূর্ণ থাকা অথবা না-থাকা ॥

এখানে কবিতা পেলে গাছে গাছে কবিতা টাঙাবো

একটি সভায় আমি গেছি বসে কাঠের চেয়ারে—
সম্ভবত টিন, যার রং লাগে প্রত্যেকের পিছে
তাই দেখে পথচারী গোয়েন্দার চোখের মতন
মেয়েদের চোখ হয়, মেয়েরা কী যেন ভাবে তাকে···

এ বাপা গেরস্ত নয়, আলাভোলা, কবির আত্মীয়
হয়তো নিজেই লেখে, না তো ছাপে অন্যের প্রতিভা!
কিছু একটা করে ওই কবিত্বের সঙ্গে মিলেমিশে
হাত মারে, হেগে যায়—রঙিন পিচকারি কিনে ভরে
ভাষার সাবান জল, তারপর ছড়ায় ছিটোয়
বিভিন্ন কাগজে···
এভাবেই, যেন গাছ, ছাদ ফুঁড়ে আকাশের দিকে
বেড়ে চলে, জীবন্ত বলেই বাড়ে, প্রাসাদ বাড়ে না—
বোদ্ধার ইটের দাঁতে ছায়া মেলে বরং ঝিমায়
ঘরবাড়ি, ফলমূল, স্বপ্নরাজ্য, কুকুরের বিচি।

তেমনি সভায় আমি বসে আছি টিনের চেয়ারে
পাশেরটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম খানিক
কাউকে বসাবো যার মুখে টক পচা গন্ধ নেই
পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক, কবি নয়, নোংরা শ্রোতা নয়
গন্ধে গোলাকার নয়, অধিকন্তু, দুই কানে শোনে!
এখানে শোনে না কেউ, কথা বলে, বর্ণনার কথা
ভিতরের কথা নয়, কানে-কানে কথা নয় কোনো।

সেই সভাটিতে গিয়ে, শুয়ে বসে, মলত্যাগ করে
আমি খুবই বিষণ্ণতা বোধ নিয়ে বর্তমানে আছি
একাকী, বান্ধবহীন। ওরা স্থির সুস্নিগ্ধ যেহেতু

কবি ব'লে-দুঃখ পায়, শরীর তছরূপ করে পায়
আনন্দ, আনন্দ! হায়, আনন্দ কোথায়, কে তা জানে?

২

বাস্তবিক যেন হাওয়া, দুরন্ত অবাধ্য ঝঞ্ঝা আমি
ছুটেছি যেখানে হেঁটে যাওয়া ছিলো প্রকৃত সঙ্গত
গাছের ভিতর দিয়ে একদিনই পরিত্রাণ নেবো
মানুষের শহরের হাত থেকে ছুটি নেবো ঠিকই
যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাবো, ভ্রূক্ষেপ করবো না
এলোমেলো করে যাবো গ্রাম, বন, মানুষ বসতি
সমস্ত, সমস্ত। কিন্তু, এভাবে কি কিছু পাওয়া যাবে?

কিছু মানে কোন কিছু। কার কিছু? কার জন্যে কিছু?
উত্তর জানি না বলে সেই কোন্ প্রত্যূষে উঠেছি
উঠে থেকে হেঁটে চলা, কোনোদিকে, হাঁটার অসুখে
শুধু যাওয়া শুধু যাওয়া—যেতে যেতে পিছু ফেরা নয়
পিছনে সভায় দীর্ঘ কাব্যপাঠ, কাব্য-আক্রমণ
আমায় হাঁ করে খাবে শহরের উদ্ভিন্ন-গলিতে।

৩

আমাকে চেনে না কেউ এদেশের নুড়ি ও পাথর
যেখানে এসেছি আমি বুঝে নিতে এবং বোঝাতে
মহিষের পিঠে চড়ে চলে যেতে উদাসীন সুখে…
আমার পিঠেও তাকে কোনো কোনো দিন তুলে নেবো—
এই পরস্পর, এই সর্বশক্তিমান দেওয়া-থোওয়া
কখনো বুঝিনি আগে, কখনো চড়িনি বলে মোষ!
এখানে কবিতা পেলে গাছে-গাছে কবিতা টাঙাবো ॥

পাথর গড়িয়ে পড়ে
গাছ পড়ে বোধে

হঠাৎ হারিয়ে গেলো, এলোমেলো হাওয়া, ভুল চাঁদ
তার নিচে দাঁত খুলে খোয়াই পেতেছে নীল ফাঁদ
বনের ভিতরে হিংস্র জন্তু আছে, মানুষেরা আছে
গাছের শিরার মতো সাপ আছে ছড়িয়ে সেখানে—
এখন কোথায় সে কে জানে ?
এখন কোথায় সে কে জানে ?

তাকে ছন্নছাড়া করে অগ্নির গণ্ডূষ
মানুষের সব হুঁশ ছেড়ে তাকে পাথর করেছে
পাথরের খেলাধুলা নদীর ভিতরে—
নদীতে কোথায় সে কে জানে
নদীতে কোথায় সে কে জানে ?

খুঁটিয়ে দেখেছি বন, বনাঞ্চল, গাছের শিখরে
যদি সে আনন্দ কিছু করে
গভীর রাত্রের খেলা যদি তাকে পায়
আমোদ বিন্যস্ত থাকে লতায় পাতায়
যদি তাকে টানে
এই প্রান্ত থেকে ভুল চাঁদ অন্যখানে—
তাকে পাওয়া !
কেন বা সন্ধান দেবে এলোমেলো হাওয়া ?
—ইন্দ্র, ইন্দ্র, ইন্দ্রনাথ ?   প্রতিধ্বনি ফেরে
বিপুল অসহ্য শব্দে ভাঙে নির্জনতা।

পাথর গড়িয়ে পড়ে, গাছ পড়ে বোধে
মানুষ হারায়, তা কি মানুষেরই ক্রোধে ?

পারি না এড়াতে, শুধু কাছে যাই

লণ্ঠনরহস্য থেকে কবিতাকে মুক্তি দেবো ব'লে
এসেছি সদর স্ট্রিট-এ, গাড়িবারান্দার নিচে নীল
সাঁতারু মাছের মধ্যে খেলা করে অবাধ কিশোর
ভিখিরির, তারো নিচে কলকাতার হাঁ-করা পাতাল
শুয়ে আছে, ভাঙা ডিম, হলুদ কুসুমে পরিপ্লুত
যেন আধুনিক কবি বিষাদের, না-কাঁড়া শাঁখের,
শুয়ে আছে বুঝি কোন সিন্ধুজলে ধুয়ে-মুছে স্মৃতি
নিভন্ত লণ্ঠন, ফাটা কাঁচ, পলতে, আমারই কবিতা।

কবিতাকে গ্রাম্য ক্লেদ, পচা পিছুটান থেকে যতো
তুখোড় শহরে আনি, ব্যথা পায়, সবজির মতন
লুপ্ত হ'তে থাকে আর ক্লোরফিল বিশুদ্ধ প্রতীকে
অনূদিত হ'তে থাকে ; অমন আলেখ্য তার অপ্সরার
কিম্ভুত বিস্ময় হয় দেবতার, তারই হাতছানি
পারি না এড়াতে, শুধু কাছে যাই, কাছে যেতে থাকি ॥

সে কিছু দুর্বল, ভালো

মানুষের ভিতরের রক্ত তাকে পাগল করেছে
দাঁড়িয়ে রয়েছে এসে, অন্ধকারে, গলির আঁধারে—
হাতে খরশান জিহ্বা ইস্পাতের, কঠিন দাঁতের
তাতে কিছু সমাপ্তির চিহ্ন এসে ধরা দিতে চায়!

আমিও মানুষ, হাতে কিছু নেই—করতলে রেখা
আছে হিজিবিজি ভাগ্য, উড়ে যায়, উড়ে-পুড়ে যায়
কিন্তু, তা কখনো ছুটে মানুষকে আঘাত করে না—
সে কিছু দুর্বল, ভালো, কিছুটা মানুষে মায়াবাদী ॥

বাংলা চতুর্দশপদী-র প্রথম প্রণেতা মাইকেল মধুস্দনে

যে-শিল্প ঐকিক নয়, তারে করো দান শূদ্রানীরে
চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে, যদি কারো
সাধ্য থাকে ! গালো পিত্ত, গালো চোখ, বেটে করো, কিম্বা ;
কলকাতায় ভেসে ওঠে আঞ্চলিক সুফী-র নীলিমা ।
তুমি পারো মেলে ধরতে খোলা-বুকে স্বেচ্ছাচারী ভাষা
ডায়ারির বিষণ্ণ পাতা জড়ো ক'রে পোড়াতে আগুনে
তুমি নও, দীর্ণ শীত-বিহ্বল সাঁওতাল, রুক্ষ চাষা
অথবা গুরুর গুরু, সংহতির গভীরে চৌচির !
তুমি কবিগান বেঁধে দোরে-দোরে অমন ঘুরো না
মুকুন্দদাসের মতো, ১৯৭০—এই সালে
হৃদয় আমিবদষ্ট, রক্ত নষ্ট, কুকুর কি কালে
সত্যবান ভারতীয় পথিকের হাঁটবে পিছু-পিছু ?
অগ্রাহ্য সান্ত্বনা, শুদ্ধ লোকায়তিকের উন্মোচনে—
কী পাবে ? সাঁতার দাও, দর্পণে, লাফিয়ে পড়ো জলে ॥

১
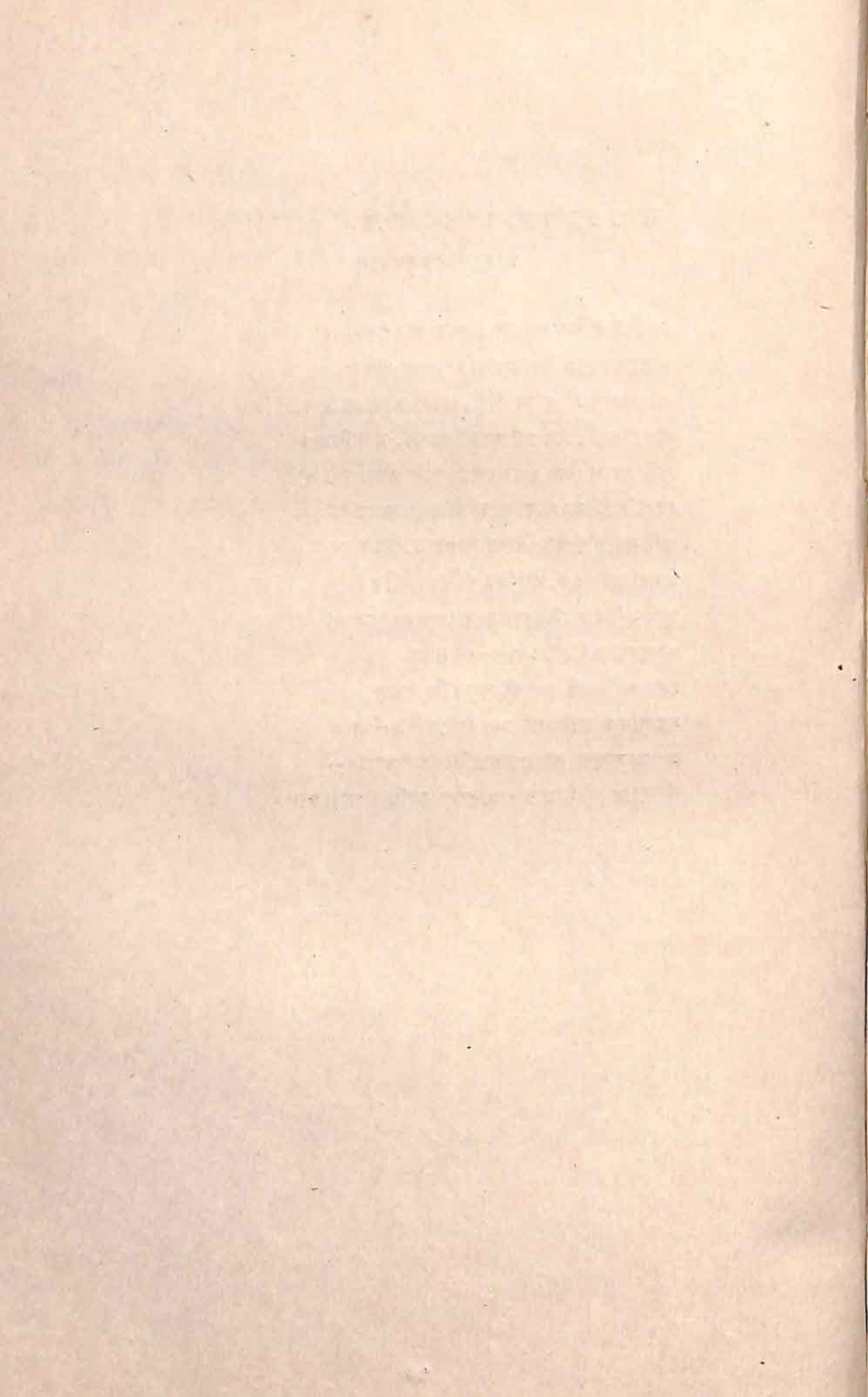
ফুলের বিছানা দেখে মনে হলো শূন্যতা যাবার
সময় হয়েছে। কোনো ভয় নেই। পরশকাতর
শরীর আমার পাবে জীবনের একান্ত পাবার
স্পর্শ, ঘরবাড়ি দরজা; এমনকি গুগ্‌গুল্ আতর
পাঞ্জাবি ভাসাবে। এই আতিশয্য মনে হবে ছার
শূন্যতার কাছে, যার জিহ্বা ছিলো বিখ্যাত মেদিনী।
ফুলের বিছানা দেখে মনে হয় শূন্যতা যাবার
সময় হয়েছে। কোনো ভয় নেই। ফুলগুলি চিনি!
সারল্যের কাছে যেতে ভাবতে হয় যাদের বয়স
এখন যথেষ্ট। কেউ পারে, কেউ পারে না প্রয়াসে।
উচিত কাঁটায় পরবশ্যতাও ম্লান হয়ে আসে—
জানি। অধঃপতনের মূলে ছিলো শান্ত দুঃসাহস।
ফুলের বিছানা দেখে মনে মোর শূন্যতা যাবার
সময় হয়েছে। কোনো ভয় নেই। ফুলগুলি চিনি।

২

এখন জেনেছি আমি একা নই, বহু মানুষের
আমার চেয়েও বড়ো দুঃখ আছে, হতাশ্বাস আছে
এখন জেনেছি আমি একা নই, মেঘ-ফানুসের
রাজ্যে আমি একা নই, কম্পমান নীলিমার কাছে।
অনেক মানুষ আছে অতিদূর শতাব্দীর জ্ঞান
ধরে যারা, দুঃখময় তাদের চিত্তের মতো আমি কিনা
কয়েক বছর বাদে-বাদে আসে সততা, সন্ধান
ক'রেও দিনান্তে পেলে মুহুর্মুহু আমারই ঠিকানা—
কার দুঃখ বৃহত্তর ? কার হতাশ্বাস এরও পরে ?
বাংলার কৃত্রিম দেশে জন্মক্ষণ-জড়ানো মিনার
ফেলে এসে দাঁড়িয়েছি অবাস্তব বিমর্ষ শহরে
আমার আগে ও পিছে লক্ষ লক্ষ অমূল কিনার—
ফুলের মানুষ। আমি একা নই দুঃখে নিরঙ্কুশ
একা নই লক্ষ্যভ্রষ্ট, চতুর্দিকে মানুষ মানুষ।

৩

কে তুমি নিরপরাধ, এই বাংলাদেশের আঁধারে
বসে আছো, একা শ্রেষ্ঠ বেদনায় আত্মসমর্পণে
সকল স্থযোগে, এই অন্ধকারে? পায় নি যে টের
অপরাধ মানে শুধু বাঁচার সদর্থ বারেবারে
খোঁজা। ভুল হোক, ভুল হওয়ায় বিক্ষিপ্ত প্রয়াসের
মর্যাদা আছেই। যদি সঙ্কুচিত হাতের পরশ
দেবে না কাউকে, তবে হাতের প্রতিজ্ঞা কিসে যশঃ-
প্রার্থী? স্থত্রপাতে পাপ মূর্তি পেতো প্রচণ্ড দম্ভের।
কে তুমি নিরপরাধ, এই বাংলাদেশের আঁধারে
বসে আছো একা, শ্রেষ্ঠ বেদনায় আত্মসমর্পণে
সকল স্থযোগে, এই অন্ধকারে, কে তুমি আঁধারে?
মৃত! যেন মানুষের মোক্ষমাত্র মরে-হেজে যাওয়া।
তোমার প্রস্তাব—পারো ন্যাংটো হয়ে রুক্ষ দর্পণের
সামনে দাঁড়াতে? পারো চুরমার জীবনে ভেসে যেতে?

৪

এইখানে একদিন অসংখ্য বালিকা এসে শুয়ে পড়েছিলো—
এইখানে একদিন অসংখ্য, একের পর, একটি বালিকা
শুয়ে কথা বলেছিলো, ফুল যতো ফুলেরে শুধায়—
তেমনি অসংখ্য কথা, এইখানে ওরা কয়েছিলো।
আমিও ছিলাম তবে বালিকার মতো মাথা দিয়ে
নাতি-আলোকিত কোনো শিকড়ের মাটিতে-মাখানো
এলোনো হাতের 'পরে ; ঘাগ্‌রার ঔদাস্য সাজালে
ওদেরি মতন বড়-ঘর-ছেড়ে-আসা অভিমানে !
সেই দিন হতে আর একযোগে বালিকারা কেউ
এইখানে আসে নাই, শোয় নাই, বসে নাই, আহা
একে একে আসিতেই উহাদের ভালো লাগিতেছে
উহাদের আর কোনো সংঘ নাই, ভালোবাসা নাই
মেয়েমানুষিতে হায় উহাদের জব্দ করিয়াছে
এইখানে একদিন উহারা শুধায়েছিলো 'বন্ধু' সমস্বরে।

৫

একবছর ধ'রে একটি শেফালিতলায় শুয়েছিলাম কেমন
মনে পড়ে। গরমের দিনগুলি মদের ঢাকায়
চৈতন্যবিহীন বহু তীব্রতর স্বপ্ন দেখেছিলাম—
সেইসব দিনগুলি বৃষ্টিতে নরম হয়ে গেছে।
একবছর ধরে সেই শেফালিতলায় অর্ধস্ফুট
ময়ূরের, মাছিদের, বহু প্রাণিদের যাতায়াত
দেখিয়াছি—একহারা ফ্রক্‌ঢাকা মেয়ের মহল
শেফালির চৌহদ্দির মাঝখানে—হৃদয় যেখানে।
তারপর একদিন শেফালিরে লাগিল না ভালো—
চলিলাম। লাগিল না ভালো কারে লাগিল না আর
শেফালি ঝরিয়া গেলো তেমনই সামান্য বাতাসে
উঠানের বুক ভরে খাড়া উঠে গেলো মুথা ঘাস—
কেবল লাগিল ভালো জ্যোৎস্নায় স্থাপিত হয়ে যবে
পক্ষকাল গৃহচূড়ে বসে-দেখা মানুষ, ময়ূর !

ঐখানে গৃহটির ছায়া ছিলো কিংবা গৃহখানি ?
আমরা অস্তিত্ব বলে যারে জানি সে কোনো নতুন
পোশাকে আসে না—তবু আমাদের রীতির বেদনা
যতটুকু লাগে গায়ে তার তাৎপর্য যতো মানি
ততোধিক মানিনাকো আমাদের পারম্পর্য ছাড়া
এই গোত্রসার সর্বনাশপ্রধান সংশয়স্থবাদী
নৈরাশ্যরে। বিষণ্ণতা মাটির ভিতরে বহু আছে।
ভূমিজ নিষ্ফল শস্য বিষয়েও ধেয়ায় দশপাড়া।
দুদিকেই পথ—তবু মুখোমুখি দাঁড়াতে মানুষ
ভালোবাসে, মানুষের মুখোমুখি জন্তুরে কখনো
দেখেছো কি ? নিরস্তিত্ব ভূত কোনো মন্দবার্তাবহ ?
দেখো নাই—ছায়া কিংবা গৃহখানি, শুদ্ধ অনুমানে
শুধাও বারংবার—এই কালে অস্তিত্ব কঠোর
সঙ্কটের সম্মুখীন—মৃত্যুর অধিক ধরাশায়ী !

আমার বক্ষের মাঝে ভাসি যাও, ধরিতে দিব না
নিন্দুকে, বক্ষের মাঝে ভাসি যাও, আমি ধরিব না—
তোমারে কি ধরা যায় ? করতলে তোমারে রহিত
করিব না কোনোদিন, শুধু তুমি ভাসিবে হিয়ায় !
কবে প্রবেশিয়া গেছো জানি নাই—লক্ষ্যের অতীত
প্রবেশ তোমার, সেকি রৌদ্রে বা সৌরভে, বৃষ্টিপাতে ?
চন্দ্রের নিম্নের জ্যোৎস্না, চন্দ্রহীনতার অন্ধকারে
কালের অগ্রজ তুমি, অথবা ধারণা—বক্ষে বাড়ে।
সংশয়···বক্ষের মাঝে ভাসি যাও, ধরিতে দিব না
জ্ঞানীরে, বক্ষের মাঝে ভাসি যাও, আমি ধরিব না—
তোমারে কি ধরা যায় ? সত্য হলে হাঁ-করা জালের
মুখে ধরা দিয়ে তুমি মানুষেরে শেখাতে ট্রাপিজ্
বাদুড়ের পরিচয় জেগে-থাকা দেবদারু-শিখরে—
সম্পূর্ণ মিথ্যাই ! তবু ভাসি যাও, ধরিতে দিব না।

৮

একটি হাঁসের চেয়ে ভারি নও, যারে বারবার
দূরের পাহাড়ে-ভরা ঝর্নায় ভাসাই প্রতিদিন।
চিন্তার চেয়েও তুমি লঘুপক্ষ, তুমি পারাবার
নও, তুমি অতিশয় রূপবান অথবা মিহিন
সুষমামণ্ডিত নও তরুবীথি—কেন বহিব না
তোমারে কয়েকদিন? প্রাতেরোর সান্নিধ্য তোমার
ভালো লাগিবে না, তবু তার ভালো লাগিবে তোমারে
অসম্ভব ভালো আর উত্তেজক—প্রণয়বিহীন।
পৃথিবীতে বহুদিন শিক্ষা দেওয়া হয় প্রাসঙ্গিক
বিষয়ে, বিজ্ঞানে, দৌত্যে—নাবিকতা, পর্বতারোহণ—
এইসব, শিক্ষাশেষে ডিপ্লোমা ও মান্য যুগপৎ
নিক্ষিপ্ত গৌরবসম ভেসে আসে—হাঁস নাই জলে
কেননা, হাঁসের চেয়ে তুমি হায় কি অপ্রাসঙ্গিক
প্রাতেরোর দুঃখ হয়, বহনের ক্লেশ তুমি করো।

৯

ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের
দয়াময়ি, দয়া করো, ভিখারিরে অন্নবস্ত্র দাও
রাখিও না ম্লানহীন উলঙ্গ আলোকে প্রকাশিয়া
লোল তরবারি—বাহ্যপ্রাকৃতিক, নৈরাশে, হাওয়ায়।
লো নিবিড় দিনগুলি বৃথা যায় বহিয়া পবনে—
দয়া করো, আজিকার মুহূর্তমণ্ডিত দিনগুলি
বহি যায়, দয়া করো—ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দাঁড়াও
ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের।
হৃদয়ে, অসংখ্যবার বালুকাবেলার 'পরে জল
এসেছিলো, বহুবার—তার পদাঘাত যায় ডাকি—
প্রাতেরো, অ্যাঙ্করহীন, ঘোড়ার অনুজ, সহোদর—
আজিকার দিনগুলি বৃথা যায় বহিয়া পবনে
ওঠো, ক্ষুর গাঁথি সব ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দাঁড়াও
হাস্যকরভাবে, বলো : দয়াময়ি, দয়া করো চিতে!

তোমার পায়ের তল মুছাতে-মুছাতে হাত কাঁপে—
অবিমৃষ্যকারিতার মতো আর কিছু নাই, আহা,
তোমার পায়ের তল মুছাতে-মুছাতে হাত কাঁপে
প্লাতেরো হৃদয়হীন, হা প্লাতেরো, শুভ্র মেধাহীন।
একান্ন কুমারী জলে সারিবদ্ধভাবে ভাসি যায়
ওরা ভালোবাসে জল, ওরা ভালোবাসে না প্লাতেরো
আমাদের, হা প্লাতেরো, উহাদের পদতল নাই
দুইশত চারি হাতে উহারা বিস্তৃত আছে জলে।
যে-বাড়িতে আছি তার পাশের সঠিক গলিপথে
সময়, বরফ-অলা, হাঁকি যায়—দু-ডাকে আলাদা
করে দেয় আমাকে, ও আমার বাবার প্লাতেরোকে।
যে-বাড়িতে আছি তার উপহৃত দু-ঘড়ি জানায় ;
দ্বিতীয় প্রভাত, দুই সূর্য, দুই সন্ধ্যা—অন্ধকার
অথচ, প্লাতেরো বলে—প্রতিসন্ধ্যা শব্দরূপ পড়ো।

প্লাতেরো, তোমারে প্রিয় ঈর্ষা করি, তুমি বহুদিন
আমার বুকের পাশে ঘুমায়েছো, পিঠের উপরে।
আমার গোলাপগুলি খেয়ে গেছো, ভবিষ্যৎ-ভরা
কবিতার খাতাগুলি—স্মরণীয় রুমালের ঝাঁক।
তবুও তোমারে কিছু বলি নাই, আত্মসাবধান
করেছি বাবার মতো। দূরদেশে গিয়েছি কখনো
তুমি কি কখনো আর বহিবে না, বহিব একাকী
দুঃখ ও স্মৃতির ভার, উপরন্তু, তোমারে, দিবসে ?
শোনো বেড়াবার গল্প—বহু পুরাতন গল্প নয়—
তোমার অদ্ভুত চোখ চাহিল বারেক মুখপানে ;
মুহূর্তে উদ্দিষ্ট তব দেখি কোনো নূতন কবিতা—
কী ভীষণ ভালোবাসো মদীয় কবিত্বে স্নানাহার !
প্লাতেরো, তবুও কোন্ মায়াবী ভিতরে ডেকে যায়
তুমি যতো খুলে দাও, প্রিয় যাই কেবলি জড়িয়ে !

১২

হৃদয়দ্বীপের ফুলে ফুটেছে সুরভি, তুমি জানো
তুমি অন্তরীক্ষ হতে মদপূর্ণ মেঘেরে ফাটাও
আমাদের মর্ম 'পরে, ওই দ্বীপে সকলে স্বাধীন—
কেবল একাকী হাঁস ঘুরে যায়, ঘুরে-ঘুরে যায়।
দ্বীপের প্রকৃতি তার জানা নাই, ও তো সরোবরে
ছিলো ভালো, কে পাঠালে ওরে আজ হৃদয় ঘেরিতে ?
হে সুরভি, ক্ষমা করো, করো ক্ষমা আমাদের 'পরে—
যখন একাকী হাঁস ঘুরে যায়, ঘুরে-ঘুরে যায়।
আমার নির্দিষ্ট ভালোবাসা দিয়ে ঢেকেছি তোমারে
হে শ্রান্তি-শিশিরে-মাখা ফুলগুলি গোলাপের মতো ;
তবু সুরভিরে তুমি ডেকে আনো বীরত্বব্যঞ্জক
গোধূলি-আলোকে যুদ্ধ হবে মোর হাঁসের সহিত—
যাহাদের পাখা আছে, যাহাদের আনখ হলুদ
আসমুদ্রহিমাচল যাহাদের আশ্রয় সুদূরে।

এখন পাতার শব্দে জেগে উঠি, পাতার পতনে
মনে হয় ওতপ্রোত বক্ষোপরে তোমার পতন
হয় নাথ! দাবানল জলে প্রতি বৃক্ষেরে ঘেরিয়া—
মালা ব্যক্তিগত অগ্নি, শুধু জাগে গোলাপের ফাঁকি
সমর্পণে। যদি যাও, আমারে মাড়ায়ে যেও সখা
ধূলায় ও বৃক্ষতলে নীরবে, বিদায় যবে রাখি
গিয়েছিলে—সে কি যাওয়া? সে কি নয় অনন্ত-মগন?
পাতাগুলি ঝরে যায়, জেগে উঠি শব্দে, শিহরণে।
এখনি, আর-একবার ডাক দিয়ে মিলাবো আঁধারে
হে বন্ধু, প্রাণের ধন, পুরাতন খেলার দোসর
চলে গেলে দেখি ওই পথ ধরে সুদূরে, একাকী—
কাছে তো একান্তে ছিলে বক্ষে মম, যবে বারেবারে
বলিতে আপন নাম, ধরায়ে দিতাম শত ফাঁকি—
'ও তোমার নাম নয়, ওগো তুমি চিরমেঘাবৃত!'

গোলাপগুচ্ছের ভাগ্য দেখে বড়ো ঈর্ষা হয় মনে
হে রমণী, অন্ধকারে, ওকে তুমি উপস্থাপনের
সকল মর্যাদা দিলে। সে কি শুধু ফুল বলে, সখী
সফল যন্ত্রণা বলে নয়? আমি বহু পরবাস
দেখেছি জীবন ভরে। তুমি নারী, তাতেও নবীনা
তুমি শুধু জানো দান, জানো ভিক্ষা, শ্রী ও মন্দেরে—
উহাদের সন্ধিকাল ঘোরতর আলোকে-জড়ানো
বিদায় ও অবিদায়। তোমাদের প্রতি মোহ হয়
এবং মেঘের প্রতি, শাদা রোমে রূপান্তরিত
ধর্ম যেন সানুদেশে, দণ্ডিত পাথরে, অন্তরালে।
তোমরা যৌবনধর্ম মানুষের—অতিমানুষের
বড়ো ভালো তোমরা হে, প্রগাঢ় সুন্দর সুশীতল—
গোলাপ-স্থাপিত বক্ষ—মর্মরগঠিত আয়োজন,
নতুবা দেখিতে চাহি লক্ষ পোড়া হাত ঘেরিয়াছে।

আজি এ কী কালরাত্রি, সমাধির শান্তি জলে যায়
যে যীশু দেবতা, তুমি মৃত্যুতে কি হয়েছো স্বাধীন
দেবালয় হতে, ওই স্তব ও বন্দনাগান হতে
আমার মতন ? আমি আজি হতে বন্দনারহিত
একটি নারীর আর গোলাপেরও। গুচ্ছে ফুলহারা
নিবিড় কাঠামো মাঝে কাঁটায় পাপিষ্ঠ ন্যুব্জদেহে
ব্যক্তিগত যীশু আমি,—অধর্ম, পাপের সারাৎসার !
রমণী, গোলাপে আর কাঁটা নাই, দারুণ গোলাপে···
সহসা, ঘুমের মাঝে মনে পড়ে খিন্ন এপিটাফ্ :
গোলাপ, তুমিই প্রেম—ভেদাভেদময় মনস্তাপ
তুমিই বরং, ওগো গোলাপ, বুকের কালো ফোঁটা
তুমি অগ্নিরাশি অয়ি নীরব সমাধি, মর্মতলে
মার্চের বাতাসে ভালো—করোজ্জ্বল, ক্রন্দনের মতো
সকল সুঠাম বৃক্ষে মৃত্যু ও স্তব্ধতা ঢাকা আছে।

সময়ের প্রতি নাই অনিশ্চয় সংশয় আমার
জানি, সে আমারে তার সবই দেবে, রাখিবে না ঢেকে
কোনো মূল্যবান তূণ। সময়, সময় কতো আশা
আমাদের থাকে প্রিয় ভ্রান্তিগুলি, ক্ষমার অধীন।
তুমি মোর প্রিয়তম, তুমি মোর যোগ্যতম নও
সহচর, হে সময়, তুমি ওরে বৃথা লক্ষ্য করো—
ও তোমারে ভয় করে ; নারীদের প্রিয় তুমি নও
লুঠেরা, ক্ষয়ের মাঝি, ওদের রম্যতা পার করো
দুর্গম দুঃসাধ্য গূঢ় ছলনায়। হে তোমার মন
ব'লে কিছু নাই, তুমি নির্জন নিশ্চিত বলবান
আমার চেয়েও। তবু, আমিই তোমার অধিকার
সকল পত্তন, যশঃ, নভোস্পর্শী সূচনা তোমার
গ্রাস করি, হে সময়, আমার মৃত্যুর পরে থাকো
আমারই বিধবা যেন, প্রতিসন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাতে !

সকল কবিতা ছোটে তোমা প্রতি। তোমার বিনাশ
খুব দূরে নয়—কাছে, বরং বিনষ্ট হয়ে গেলে
ইতিমধ্যে, হে করুণা, আমার নির্ভুল শরক্ষেপ
কবিতার। কোথা যাবে? কোথায় আশ্রয় পাবে খুঁজে?
রন্ধ্রহীন বন্ধ, শুধু কৃত্রিম উপায়ে অনচল
কোথায় আশ্রয় পাবে, না ফুলে না গন্ধে, কোনোদিন!
কেননা, সকল প্রাণ, সব মৃত্যু আমাকে তাদের
বুকের ভিতরে রেখে বাড়ায়েছে। আমি কি বিমান
নভোস্থলে পাখিদের, ময়ূরের দৌত্যে নিমজ্জিত—
মেঘে ও বাদলে? আমি মৃত্যুর আপন বক্ষতল
তোমারে জীবিত-মৃত সর্বক্ষণ, বক্ষে ধরে রাখি।
কোথা যাবে? ঝ'রে ফুল মৃত্তিকায় আসিতে হবে না?
কোথা যাবে? ঝ'রে ফল মৃত্তিকায় আসিতে হবে না?
সুগন্ধির পার আছে? সে-ও মম বক্ষে ঝরে পড়ে।

১৮

আজো কি যাবে না ভোলা অসম্ভব মর্মরস্তবক—
তালবীথিকার পার্শ্বে তোমার মুরতি আজো রবে ?
আজো কি যাবে না ভোলা হে প্রেয়সী, হে প্রতিবন্ধক—
হে মম প্রাণের গূঢ় পরিণয়, অন্ধকারে, কবে
দেখেছিলে ? সব দেখা প্রিয়সখি করো না বিদায়
দূর হতে, কাছে এসো—কাছে থাকা বড়ো প্রয়োজন
আজই কি বিকাল হতে ইমারতবদ্ধ জানালায়
তোমার বিপুল স্তব্ধ তর্কাতীত অঙ্গুলিচেতন
ভালোবাসাময় হাত দেবে নাড়া—ডাকিবে আমারে ?
মর্মরের মতো ভালো, মর্মরের মতো আন্তরিক
কেহ নাই দুঃখহত, অভিমান-ব্যথায় বিমূঢ়
এবং তোমার মতো কেহ নাই—রাঙা পারাবারে
যে তরী ভাসায়ে ছিলো, সে আর ফিরাতে নাহি পারে—
তালবীথিকার ক্রোড়ে হে মুরতি, তুমি কি বিধুর ?

আমাদেরও শরীরের আস্ফালন জেগেছে পাৎলুনে—
না, তবু প্রেমের মাঝে হৃদয় জাগাতে চাই খুব
একমাস ধরে ডিমে তাপ দিয়ে দেখেছি, সঙ্গম
ঢের সোজা, এমন কি বেশ্যারও হৃদয়ে পথ আছে।
অনেক কবরখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কবরে
তিলধারণের জায়গা নেই, শুধু আমিনের ঘর
খালি আছে দীর্ঘদিন, মৃতেও ঘুমাতে ভয় পায়—
সেই ঘর বিচক্ষণ আমিনের প্রহরায় আছে।
তিরিশ বৎসর পরে—চতুর্দিকে তিরিশ বৎসর
হেমন্তের ঝরাপাতা জ্বলে যায়, জঞ্জাল তোমার
অনেক আদরণীয় করে তোলে—বিমূঢ়তা নয়
পিকনিকের উপযোগী হয়ে ওঠে পৃথিবী অন্তত।
অনেক কবরখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কবরে—
শুধু ওই আমিনের বিচক্ষণ ঘর আছে খোলা।

২০

সেদিন খেলারও ছিলো কত সজ্জা, কতো সরঞ্জাম—
মাঠের বাহার ছিলো। আজকাল জীবনেও নাই
তেমন বাহবাস্ফোট। জীবনের শাসনপ্রধান
তালিবনে জ্যোৎস্না মেখে ধবল মার্বেল পড়ে আছে।
তুমি চিরদিন যদি খোঁজো তাঁকে, পাবেই একদা
তুমি চিরদিন যদি ভালোবাসো, ভালোবাসা পাবে।
ওয়েলিংটন থেকে যেন ঐ সাম্রাজ্যের শুরু
মার্বেলের উপরের কিরীট জ্যোৎস্নায় ভাসিতেছে।
অই দুঃখ সচেতন, অনুরোধ করো না কখনো
অভিষিক্ত হতে কোনো রাজপদে—আমি পরাঙ্মুখ
অন্ধ আমি, জ্যোৎস্না হতে মার্বেলের প্রদীপে কম্বল
ধরে আছি দীর্ঘদিন, যতক্ষণ তাপ নাহি লাগে।
যদি চিরদিন তুমি খোঁজো তাঁকে, পাবেই একদা—
তুমি যদি চিরদিন ভালোবাসো, ভালোবাসা পাবে।

২১

অনন্তসাগরে ভেসে যায় আজি সকালে-ভাসানো
তরী, হে আমার তরী—আমারে কে বিকালবেলায়
বলে গেলো, ক্ষয়হীন নিবিড় সুষমা ঘরে আনো
প্রান্তরে তোমার একি বসে থাকা, স্মরণ-অতীত ?
আমি কি তোমারই প্রতি ভাসিয়েছিলাম তরীখানি
হে নূতন জন্মভূমি, লক্ষ্যহারা কূটজ ফুলের
হে নূতন, দেশহীন পারাবার-প্রভৃতি সন্ধানী
আমার তরীর চেয়ে দীর্ঘ ও ব্যাপক তরী আছে।
সমষ্টির কাছে আমি শূন্যহাতে কীভাবে দাঁড়াই ?
নির্লিপ্তি তোমার সাজে, অতিরিক্ত দেহপরবশ
আমি কি আমার চেয়ে কোনো বড়ো দেহতে মিশাবো ?
অথবা, কোথাও স্বেচ্ছাচার ব'লে সত্য কিছু নাই
পরাধীন ভালোবাসা, এমন কি সাগরের জল
নিতেও না পারে ঐ তরীখানি, কিংবা নিতে পারে।

দূরের জানালাখানি হতে ফেলে দাও পত্ররাশি
তোমার অটুট হাত যেন লিখে যায় পরিণাম
হে মৃত কিশোর. আজি ভোরবেলা জাগিবে না কেন ?
রাতের হেমন্ত এসে ঢেকে দিলে কিশোরের হাসি !
দূরের জানালা হতে ঝরে যায় প্রতিঘাতী সিঁড়ি—
অবতরণের কাল। অমূলক বাসনা আমার—
ঝরে যাবো, কেন নই এতোদিনে তব করাহত ?
রাতের হেমন্ত রাতে ঢেকে দেয় পতিত সম্ভার।
দুঃখ কি আমার সাজে ? রবো আমি তব পদচ্যুত
জনৈক পত্রের খোঁজে, হেমন্তের ভেদ ক'রে ত্বরা
জানি না কী করে গেছো পত্রের অনলে অন্তর্ভূত
হে কিশোর, মাংস নয়, তবু হিংস্র জন্তুর মহড়া
আমারে দণ্ডিত ভেবে চতুর্দিকে কোলাহল করে
দূরের জানালা হতে পত্র ঝরে—দূরে যাবো ভাসি।

২৩

আবার জ্যোৎস্নায় ফিরে আসিব কি, আরো একবার
জ্যোৎস্নায়, আঁধারে নয়—অবাস্তব রুপোলি জ্যোৎস্নায়
আবার আসিব ফিরে ? মনে পড়ে, মোটে সত্য নয়
এমন মিথ্যারে ভালোবাসিতাম দীর্ঘকাল ধরে।
সেই ভালো হতো যদি কোনোদিন নিবিড় আঁধার
আমারে দিতো না দেখা আশিখর কলঙ্কালিম্পন
স্পর্শ না করেই শুধু যেতো দূরে, অনাক্রমণীয়,
ক্ষতি কি অর্শাতো খুব, যে সশঙ্ক পূর্ণতা পাবার ?
এখন আঁধারে আমি, বস্তুত গাধার পাদদেশে
শুয়ে আছি, শঙ্কাহীন, ধর্মলোভী—ব্যয়ের অতীত
অথচ সত্যের মতো উপদ্রব পাবো স্ববিন্যাসে
জ্যোৎস্নায় ফিরিব না হে, জ্যোৎস্নায় বিক্ষত দিবানিশি
আবার চাপল্যরাশি ভাসাতে কি সময় যাবে না ?
হয়তো ফিরিয়া ভালো লাগিবে না এই বঙ্গভূমি !

এখন চেতনা বড়ো সীমাবদ্ধ। এখন পায়ের
তলায় ফুলের রাশি ভেদ ক'রে চলে যেতে পারে
মানুষ এমনই আজ। স্নেহ, সমাদর আজিকের
সভায় আহূত নয়,—আজি সীমাবদ্ধতা আঁধারে।
এখন নতুন বহু নিষ্ঠুরতা হয়েছে উদ্ভূত
বন্ধুদের কাছে, নরনারীপ্রিয়দের অতি কাছে
ভয় ও বিশ্বাসমতো এ নতুন পুরাতন ছুতো
ধরে বসে যাবে বুকে, মানুষ ফুরাবে প্রাণ গাছে!
তবুও দুর্বার বলে শয়তানের মুখশ্রী জ্যোৎস্নায়
মিলাই বাঘের সঙ্গে, অভিপ্রেত মিলনবিধানে
নয়, মনে হয় দেখি শেষচেষ্টা ভালোবাসিবারে।
এখনো কথার মতো কথা বলে মানুষই আমায়
জন্তুরা বলেনি কথা অতিমাত্র চেতনাপ্রসূত
সকলে অপেক্ষা করে মিশে যাবে সুরভি, সম্মানে।

২৫

চামেলির দুইখানি বাড়ি ছিলো—এখন আঁধারে
ও দুটি ব্যাপকভাবে হয়ে যায় অরণ্য বাড়ির।
হৃদয়ের দুই অর্ধ চামেলির অনেক হৃদয়
হয়ে যায় অতর্কিত, স্বতন্ত্র, শস্যের সমাহারে।
আমি চামেলির কোন্ বাড়িতে ছিলাম মনে নাই—
সেখানে চামেলি ছিলো ? চামেলি কি এমনই তৎপর
সরে গেছে আঁধারের অসম্ভব মশারি সাঁতারি—
কিংবা সম্মুখেই আছে, দেখি নাই হিন্দুর ঈশ্বর !
চামেলির মতো আমি মানসিক বাস্তু-বিভাজন
মানুষে তাবৎকাল দেখিয়াছি—জন্তুতে ক্বচিৎ
ওরা স্পষ্টতার মানে বোঝে প্রাণ, কোনো আলোড়ন
চিন্তায় ও সত্যে নাই। ওদের দুয়ারে যতক্ষণ
থাকি, মনে হয় আছি প্রাসাদের পালঙ্কে শয়ান
হে প্রাণ, হে ধিক প্রাণ—বিফলতা, চামেলির প্রতি !

সারারাত আমাদের পিছু পিছু ছুটেছে পুলিশ
কেননা, বিকেলে মজা গঙ্গাতীরে সূর্যের হত্যার
একমাত্র সাক্ষী এই আমরা তিন উল্লুক কাঁহাকা
কলকাতার প্রকৃতির অশ্লীল তদন্তে চমৎকার
পোঁদের জ্বালায় হু হু করতে-করতে দিক্‌বিদিকহারা
—তবে নাকি কলকাতায় নিরঙ্কুশ প্রাণিহত্যা হবে ?
শিল্প হবে ? তেজারতি কারবার খাওয়াবে ভিখিরিরে ?
মাঙ্গল্য বিদেশ থেকে আনা হবে, হে শিক্ষানবিশ
ন্যূনতম টেলিফোন পোঁতা হবে পাহাড়ের শিরে—
পাহাড়বিজয় হবে, যদিবা অজেয় থাকে কেউ !
মানুষ, মানুষ ক'রে একদল কবি তোলে ঢেউ
পুকুরেই—আহাম্মক, চোর, বদমাস লক্ষ্মীছাড়া
সম্ভ্রম জানলি না, শুধু লিখে গেলি পদ্য পাতপাত !
আমরা তিনজন কবি কারে লক্ষ্য করেছি দৈবাৎ ?

একভাবে চিরদিন সমাজের সেবা করে যাওয়া
অনেক আদরণীয় মনে হয়—আমার যে দিন
ভেসে গেছে, ভেসে যাক ; নূতন গাছের অধিপতি
এসে যে-গাছের 'পরে শুয়ে রবে সে-ই তার গাছ—
এরাও নিরভিমান আত্মীয়ের দেখাশুনা করে,
আমাদের মতো নয় পরমুখাপেক্ষী ও স্বাধীন
একচ্ছত্র কবিতার সিংহাসনে, পিচ্ছিল নর্দামা
এদের গাছের ডাল হতে নেমে গিয়েছে সদরে
কাছারির বামপাশে—পুষ্করিণী পদ্মফুলে ঠাসা।
মানুষের জীবনের জমিদারি উঠেছে নিলামে
রাবিশ, শস্যক্ষেত্র, কাঠের আসবাব দাম দেয়,
প্রতিষ্ঠানে নির্বাচণ জমে ওঠে, দেহের বিচারে
এখানে-ওখানে রসপাত ঘটে, পুনরভিনয়
রোমাঞ্চিত করে—শুধু জন্মমৃত্যু থাকে অবিচল।

আমার দৈনিক শুধু একপাত্র মদ্যপান চাই—
বিমূঢ় প্রাসাদ আমি চাই না জিহ্বায় ঢেলে খেতে
এবং চাই না কোনো অ্যাভিনিউ, স্তব্ধ পামবীথি
মাধবের কোলে বসে ফলের নির্যাস খেতে চাই।
বিষণ্ণ রোগীর কাছে হসপিটাল আবেদন করে :
তেমন রুপালি কোনো নার্স নাই, ফলাফল নাই।
জোয়ারে কেবলি জল এলোমেলোভাবে খেলা করে
পদতল ভরে যায় নূপুরের আক্রমণভার।
আমারও অনেকদিন হতে ইচ্ছা ছিলো করতলে
তোমার মুখের ওই ভূমণ্ডল করিব স্থাপন
লিখিব : ১৯৬০ জানুআরি, অমুক-কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হয়—যাতে ভক্ত আসে, দেবতাও আসে।
স্বাভাবিকতায় কোনো ধর্মের বিক্রয়মূল্য যতো
তার চেয়ে অল্পদামে আসবাব বিক্রয় হয়ে যায়!

২৯

শুভ্রতাই শুধু জানি পবিত্র ও অতিব্যক্তিগত।
শুভ্র তুলা উড়ে যায় বাতাসের কাশ্মীরের দিকে—
পশমের মতো যতো ভেড়াগুলি উদাসী চরাও
ক্ষেতের সবুজ তৃণ দেবে না তোমারে আলিঙ্গন।
তুমি ও-তৃণের নও, তুমি নও কার্পাসতূলার
তুমি নও পশমের উষ্ণতার মতন স্বাধীন
তুমি ধর্মপ্রাণ নও ; ভেড়াগুলি শুধু রাখালের
তুমি মায়ামোহভরা বিকালের প্রতিবন্ধকতা।
ওগো মেঘ হতে তুমি মাত্রাহীন করো রক্তপাত
আমার শিহর লাগে ! সকল হত্যারে মনে হয়
অতি ভালোবাসাভরা ঐকান্তিক সাধের পতন—
শেষ নাই, ত্রুটি নাই, অনিমেষ আঁখিগুলি নাই
শুভ্র তুলা উড়ে যায় বাতাসের কাশ্মীরের দিকে—
তুমি শুভ্রতার মতো পবিত্র ও অতিব্যক্তিগত।

৩০

পলাশ, এবারে তুমি সবই জানো। যে হতচেতন
বালুকার পরে ছিলো তৃণহীন প্রতিষ্ঠা চাষের
এবার সকল ক্রটি, সবই তার। পুনরভ্যুত্থান
হয় না ফলের, ও কি রাজনীতি, ক্ষমা, স্বাধিকার ?
এবার চাঁদের প্রতি তারকার যৌনতাই সব—
মনে হয়, ওষ্ঠ শুধু চুম্বনের নিষিদ্ধতা জানে
ছুরি ও কৃপাণ খোঁজে মর্মহীন মুষ্টি ঘাতকের,
পলাশের অভিমান, হায়, যাকে স্পর্শ করেছিলো !
এবারে, পলাশ, তুমি সবই জানো, তবুও সহসা
জনহীন মর্ম লয়ে দাঁড়াতে কেবলি ইচ্ছা করে—
হয়তো আবার কতো খেলা হবে, মেঘের পশ্চাতে
তখনি অশ্রুর ফাঁদ পাতা হবে পরিপাটি ক'রে
পলাশ, তুমি কি তার সবই জানো, বহুদূর হতে
পলাশ, তুমি কি নও আজীবন স্পর্শভারাতুর ?

অনেক শেফালি আমি দেখিয়াছি, এ-জীবনে আর
দেখিতে চাহি না কোনো শেফালিরে, শেফালি দেখুক
ঝরিতে-ঝরিতে পারে দেখে নিক অপাঙ্গে আমায়
আমি কোনোদিন কিছু দেখিব না, ডুবিয়া মরিব।
অনেক জেব্রার খেলা দেখিয়াছি—ম্যুজিয়ম-লুণ্ঠিত জেব্রার
খেলা দেখি নাই, তার অলৌকিক গায়ের বুরুশ
ঝরে গিয়েছিলো জানি ; মৃত্যু ও স্মৃতির অবধেয়
রূপ ও মুখশ্রী নাই, জীবিতেরই কায়ক্লেশ আছে।
তাই আমি শেফালির, কিছুতেই বকুলের নয় ;
শেফালি ঘড়িতে ঝ'রে গত মুহূর্তের স্তব্ধ কাঁটা
হলুদ বোঁটার জোরে ক'রে দেয় চলচ্ছক্তিময়—
তাই আমি শেফালির, সৌজন্যের, অতিরিক্ততার···
তাই আমি শেফালির, আপাদমস্তক শেফালিরই
চাহি কোনোদিকে কিছু দেখিব না, ডুবিয়া মরিব।

সাধ নাই হে সুন্দরি, সাধ নাই পরান ভরিয়া—
অথবা ঝরিয়া গেছে সব সাধ হেমন্তের মতো ;
তবে আর দিবসের সম্ভাবনা ঝরিলে প্রান্তরে
কেন রাঙা বেদনায় এ-প্রাণ ব্যথিত হয় ঘোর ?
প্রান্তর ও মনের মাঝে হয়তো অতিক্রান্ত ও পৃথক
একটি ফাটল আছে, যার প্রতিবিম্বও পড়ে না
একটি দুর্ঘটনা আছে, যার ফলে মৃত্যুও সরল
একটি পালের গায়ে হাওয়া লাগা—সহসা ওপারে।
সাধ নাই হে সুন্দরি, সাধ নাই পরান ভরিয়া
তোমার ব্যবস্থা করি—শোয়া-বসা-ভ্রমণ-উঠান,
সাধ নাই পায়ে ধরি, বসাই নিভৃতে তৃণাসনে
তাও তো যথেষ্ট হতো, সুন্দরের সকলই অপার
সুষমা বলিয়া বোধ হয়, হায় সুষমা সংগীত—
কোনোদিন শুনিব না, শুনিব না কোনোদিনও আর !

চূড়ান্ত সঙ্গম করে কুকুরেরা।   সমসাময়িক
নগরে, বৃষ্টির দিনে, নরনারী পুত্রার্থে ধেয়ায়
দোতলার লাল মেজে হাঁটুতে বিস্তৃত করে বল
অভ্যাসবশত মদ্যপান হয় রতিক্রিয়া-শেষে।
এ-বছর শীতকালে কলকাতায় মৌসুমী-শিল্পের
প্রদর্শনী হয়েছিলো, ডালিয়ার-চন্দ্রমল্লিকার
আখাম্বা গতর কেড়ে নিয়েছিলো আদি পুরস্কার
কুচ্‌কাওয়াজ-অন্তে গাইলো পুলিশেও রবীন্দ্রসংগীত!
তবু ন্যূনতম কিছু কবিতাও লেখা হতে থাকে
'প্রতিপ্রাপকতা' নাম্নী শব্দ নিয়ে করে না তোলপাড়
এইসব লেখকেরা।   এইসব লেখকেরা, হায়
বেশ্যার নিকটে গিয়ে বলিল না, সম্ভ্রম উঠাও
দেখি হে তদ্‌বির-ভরা দেহখানি—কিংবা কম্যুনিস্ট-
পার্টিতে যোগ দিলে পাবে পুরুষানুক্রম যজমানি!

৩৪

যেন জানলা বেয়ে যাবে, তাই তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন।
উল্কি দেগে দিয়ে গেলে বুকের উপর বারংবার
সময়, ঘোড়ার মতো অন্ধ ক্ষুর পাথরে আছড়ায়,
সবার জানলার নিচে, গুপ্তচর, পরিচয় দাও—
একটি ফুলের নাম বলে যাও গোপনতা ছেড়ে
নতুন ছুরিকা দেখছো, এই ভাবে, কীর্তি দেবো ফুঁড়ে
চুম্বনে বুঝেছি চোর, শেয়ালের মতো বার্তাজীবী
অর্থ ও প্রতিষ্ঠা নয়, করো দীর্ঘস্থায়ী আলিঙ্গন।
সে সময়ে বেশ্যাদের, বিপন্ন গণিকাদের প্রতি
গুপ্ত কোনো মোহ থেকে—পরবশ্যতায় কভু নয়
দাবি ছিলো। বুঝিতাম, বাগ্মী শুধু দেহ, মন নয়,
বুঝিতাম এইরূপ। কামনার মন্দির ও জঙ্গল
এইখানে। যত হোক হৃদয়ের কোম্পানি তছরূপ—
এইখানে সারাদিন সারারাত বগল বাজাবো।

দরজা ভাঙতে দেখা গেলো, হ্যারিকেনে যতো দেখা যায়
বহু সময়ের এক সুন্দরীর দেহ ফেলে ছায়া
দেয়ালে। তবে কি ছায়া প্রাণময়ী তুলনামূলক ?
আমাদের চোখগুলি দুঃখে ও তদন্তে স্তব্ধ হলো।
তুমি কার ? আদালত-অধিবেশনের দিন শেষে
তুমি কি বিচারাতীত স্মৃতি কোনো ব্যক্তিগত প্রাণে ?
বরং সবার, যারা তিনজন ভালোবেসেছিলো
আপন নারীরে লয়ে তোমারই আশ্রয়ে খেলা-করা
কয়েক বছর ধ'রে। অতিবিজড়িত শালবনে
একাকিত্ব ছাড়া আর সবই আছে, দৃষ্টিহীনতাও।
দুর্দান্ত নগরে বসে প্রাকৃতিক অতিপ্রাকৃতিক
বাধ্যতামূলক প্রশ্ন এসে যায়, তোমার মতন
নাশকতাহীন নারী কেমনে নিজেকে ধ্বংস করো ?
সুন্দরি, বিখ্যাত কোনো উন্মাদনা ছিলো না ভুবনে।

আশা ছিলো সন্তানের উৎপন্ন চুলের পরে হাত
রাখা যাবে, আশা ছিলো—এরকমতর ছিলো আশা
সংসারে ও চৌরাস্তার হ্যাংটার মুখশ্রীখানি দেখে
একদিন অন্ধকারে নিজহাত রেখেছি মাথায়।
সেইদিন অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ নারীরে জানিয়ে
রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য, কবি-সংবর্ধনা ও ম্যাজিক
বলেছি, যখন বলবো 'লাইট মোর লাইট' তখনই
জ্বালিয়ে দেবেন, যেন শ্মশানে রৈ রৈ করে আলো।
স্টেজ্ নিষ্প্রদীপ। শুধু বেজে যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট ঘড়ি
সময় কি থেমে আছে? সময়ের সাড়া নেই কেন?
আপনারা, সামনের যাঁরা তাঁরা দয়া ক'রে বসে পড়ুন
নচেৎ···প্রম্পটার, তুমি ভবিষ্যৎ থেকে প্রম্প্ট করো
যেন শুনতে পাই, শোনো এ-নাটক মাইরি পড়া নেই—
কী ভয় করছে রে শালা, বাকি সব কাষ্টিং কোথায়?

মহীনের ঘোড়াগুলি মহীনের ঘরে ফেরে নাই
উহারা জেব্রার পার্শ্বে চরিতেছে। বাইশ জেব্রায়,
ঘোড়াগুলি অন্ধকার উতরোল সমুদ্রে দুলিছে
কালের কাঁটার মতো, ওই ঘোড়াগুলি জেব্রাগুলি
অনন্ত জ্যোৎস্নার মাঝে বশবর্তী ভূতের মতন
চড়িয়া বেড়ায় ওরা—কথা কয়—কী কথা কে জানে ?
মানুষের কাছে আর ফিরিবে না এ-তো মনে হয়
আরো বহু কথা মনে হয়, শুধু বলিতে পারি না।
বাইশটি জেব্রা কি তবে জেব্রা নয় ? ময়ূরপঙ্খীও
হতে পারে এই ভৌত সামুদ্রিক জ্যোৎস্নার ভিতরে ?
বামনের বিষণ্নতা বহে নেয় ও কি নারিকেল
ও কি চলচ্ছবিগুলি লাফায়ে-লাফায়ে যাবে চলে ?
ও কি মহীনের ঘোড়া ? ও কি জেব্রা নয় আমাদের ?
অলৌকিকতার কাছে সবার আকৃতি ঝরে যায়।

বেদনা অশ্রুর নয় কেহ—ও কি পরিমেয় ফল ?
আপেলের ফুলটির সত্য ও সুগন্ধ বুঝিয়াছে
বেদনা ফুলের যতো ততো তার পাতাও বোঝে না
ভূতলে শিকড়ে মূলে অলৌকিক তারবার্তা করে
কুঠারের কাছে এতো প্রাণস্পর্শী গূঢ় নিবেদন
মানুষের মাঝে কেহ দেখিবে না—কি তার হরফ
শ্বেত পাতাটির পরে যে-কবিতা অলিখিত ছিলো
মানুষ তাহারই পরে দর্শনীয় কীর্তি খাড়া করে।
চিরদিন প্রেম ছিলো গন্ধের মতন ছিলো গূঢ়
অলীক পাথর চাপা দেওয়া ছিলো, যেন গুপ্তধন
ভিখারি কি ভিক্ষা ভুলে প্রান্তরে সন্ধান নিতে যাবে ?
আমরা দেখেছি রাজা ভুলে গেছে গোলাপ তুলিতে
আমরা বন্ধক দিতে পারি জমি, যা আমার নয়···
অশ্রু ও বেদনা হতে ব্যবধান হোক্ না সন্দেহ !

ভিত্তি থেকে দেখা যায় ভুবনের চন্দ্র-নক্ষত্রকে
শামিয়ানা থেকে তারে দেখা যায়—আজিও তাদের
খেলার তরণী ভাসি আসে ; শুধু মহিমা আসে না।
ছাদের উপরে গেলে জানি আমি সকলই দেখিব।
ওগুলি তরণী নয়, ঐতিহ্য-গঠিত নৌকা নয়—
ওগুলি অর্ধেক রাঙা আলোকের, অর্ধেক আঁধার—
অলৌকিকভাবে একটি সিঁড়ি দিয়ে কিছু উঠে যায়
কিছু নেমে যায় পরিপার্শ্ব থেকে, ঝ'রে যায় যেন।
সাগরের কাছে আমি দাঁড়ায়েছি, মাঠের ভিতর—
বামনের মুখোমুখি কিংবা দীর্ঘকায় নারিকেল ;
সকল মুহূর্তে এক অমনোযোগিতাময় সিঁড়ি
আমারে উদ্ধার দিতে বারংবার কাছে এসেছিলো
ঐ সিঁড়িগুলি কোনো নূতন প্রাসাদ থেকে নয়
খুবই পুরাতন, কিন্তু দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ছিলেন।

যেবার ওদের সঙ্গে যেতে হলো বেড়াতে পশ্চিমে—
মানুষ বেড়ায়! তাই বহুদিন সাহাবাবুদের
কালো ছেলেটির কাছে ছিলে তুমি, মোটে ফর্সা নয়
আমার মতন, আহা প্লাতেরো, তোমারই কষ্ট হলো!
পশ্চিমের থেকে কিছু ঘাস আমি তোমাকেই পাঠাই
খামের ভিতর, তুমি পোস্টাপিস থেকে চেয়ে নিও
খামটা খেয়ো না, ওতে আঠা আছে, কালিতেও বিষ—
পেটের অসুখ হলে কে তোমারে দেখবে প্লাতেরো?
মনে আছে, কিছুদিন আমাদের বাড়ির উঠানে
তোমার চারিটি পায়ে জুতোমোজা পরিয়ে বলতাম:
প্লাতেরো, অঙ্কের ক্লাসে এইভাবে ফাঁকি দিতে হবে—
এইভাবে খেতে হবে কড়াইশুঁটির প্রস্রবণ।
মনে আছে, মনে আছে, মনে আছে প্লাতেরো আমাকে?
—সাহাবাবুদের কালো ছেলেটি আমার চেয়ে কালো!

প্লাতেরো আমারে ভালোবাসিয়াছে, আমি বাসিয়াছি
আমাদের দিনগুলি রাত্রি নয়, রাত্রি নয় দিন
যথাযথভাবে সূর্য পূর্ব হতে পশ্চিমে গড়ান
তাঁর লাল বল হতে আল্‌তা ও পায়ের মতো ঝরে
আমাদের—প্লাতেরোর, আমার, নিঃশব্দ ভালোবাসা।
প্লাতেরো তুমিও চলো সঙ্গে, আমি একাকী প্রস্রাব
ফিরিতে পারি না, কারা ভয় দেখায়, রহস্যও করে!
ছেলেবেলা থেকে কিছু ভীরু হতে পারা বেশ ভালো।
আমায় অনেকে ভালোবেসেছিলো—ফুল দিয়েছিলো
টুপি কিনে দিয়েছিলো, পুরী থেকে মুরলি মাছের
লেজের শাসন এনে দিয়েছিলো—কতো উপহার!
আমি ছেলেমানুষের মতন ওদেরও ভুলিনি তো?
প্লাতেরো আমার আর আমিও প্লাতেরো ছাড়া নই
—আমাদের দেবতা কি পা ঝুলিয়ে বসেন পশ্চিমে?

হৃদয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে—আছে ঝাউবন
শকুন রয়েছে। ওরা পচা মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে ব'লে
পরিবর্তনীয়ভাবে আমাদের সৌরভ তোমার
নিবেদন করি ওগো শ্যামাঞ্চল-খোদিত দেবতা।
তুমি ফিরাবে না জানি, তুমিই গিয়েছো একদিন
হরিণে বসিয়া বহু হৃদয়ের ব্যাপ্তিরও অধিক
দূরদেশে—ফিরাবে না। হৃদয়ে কি তুমুল ঝাউবন
ঝড়ের মতন ঝাউবনগুলি, শকুন রয়েছে।
ভয় হয় যেতে, তবু না যেতেও ভয়ের অধিক
ভয়—হয় পুরাতন কবরে মর্মরধ্বনি হয়
ছেলেমেয়েদের দলে অনেকে বস্তুত নেমে গেছে
এতক্ষণে হৃদয়ের পথগুলি ভরেছে ছায়ায়।
আমিও, প্লাতেরো চাই বহুক্ষণ চুমাতে তোমারে,
নেমে যেতে হৃদয়ের যেইখানে দেবতা আছেন।

দুর্বলতা ছাড়া কোনো দোষ নাই।   যখন ডালিম
সবুজ পাতার চাপে ফুলে ওঠে, লাল হয়—জলে
তখন আক্রোশভরে চাদর টানিয়া দিই খুব
মাথার ওপারে, তুমি ডেস্কভরা চিঠি লেখো যতো।
অরফ্যান্ ছেলের দল এবারেও ক্যাম্প পেতেছিলো
জানুআরি মাসে তারা রেখে গেলো শক্তিশালী ঘড়ি
অথচ উৎপল একা পুরীর মন্দির সারাবার
হাতচিঠি পেয়েছিলো—তবু হাত হতাশ হয়েছে !
তোমার পাগল তুমি বেঁধে রাখো, একদল যাবে
নারীদের সাথে করে অগোছালো গোধূলিবেলায়
ক্যারম খেলার ছলে মারাত্মক দুঃখ বিনিময়
ঘটে গেলো—চিরদিন কে আর ক্যারম খেলে বলো ?
অথচ অভ্যাস নয়, দুর্বলতা ছাড়া বোঝাবার
হয়তো মাধ্যম আছে—তুমি জানো, ডালিমেও জানে।

একটি চেনার গাছে ঢেকেছিলে, মনে হয় তুমি
তোমার ও-ফোটোগ্রাফ জনশূন্য সমতটভূমি
কিভাবে টাঙাবে? আজি বাল্যের মহান কলরোল—
পৃথিবীর একদিকে জমে গেছে লুকোচুরি খেলা
এইভাবে সঙ্গহীন মাথা লয়ে উপদ্রবময়
উঠানে ঘুরপাক খেতে মজা লাগে ; ডুবে গেলে বেলা
একশ বাঘের গলে হাড় ফুটেছিলো মনোমতো—
গল্পের বারান্দা হতে বারান্দায় ভেসে যাওয়া হয়।
আজকাল নর্তকীও নাচ জানে, শিক্ষার বাহন
মাতৃভাষা। বনোমাঝে ফাঁদ পাতা অলীক কারবারে
বসন্ত বিক্রয় হয়ে যায় বারবার, তুমি জানো
চেনারের গাছ আমি অসতর্ক স্বপ্নে দেখি নাই—
তোমাকে তো দেখিয়াছি—যখন লাগিয়া গেছে ভালো
মনে হয় চেনারের অত্যাচারও সহিতে পারিব।

৪৫

দেশে তিলধারণের জায়গা নেই, উত্তরে ইঁদুর
দক্ষিণে ইঁদুর ;   কোনো সূর্য নেই, মানবতা নেই।
দেশান্তর পেতে চায় মুহুর্মুহু গোপন রপ্তানি
এই ইঁদুরের লব্ধ প্রবলতা, পবিত্রতা-গ্রাসী।
জাহাজ তোমার কাজ নির্লিপ্তভাবেই ক'রে যাও
নিয়ে যাও বুকে ক'রে স্বাগতসাপেক্ষ মূল্যবান
ইঁদুরের স্তম্ভগুলি, আব্‌গারিকে মুদ্রায় স্খলিত
ক'রে পুঁতে দাও আজ ভয়হীন দণ্ডিত পতাকা।
কেবল ইঁদুর ঘোরে পৈশাচিক মণিবন্ধে·ঘড়ি—
ঘড়ির উপরে শুধু ইঁদুর শাসন করে কাল
আর কেউ নেই, আর কিছু নেই সৌন্দর্য-কঙ্কাল
সমার্থবাসিনী, দেশে স্বপ্ন নেই সমর্থন করি।
জাহাজ, তোমার কাজ আজ হতে সোজা পথে ভাসা—
আজ হতে জাগরণ, নিদ্রাহীন, প্রিয়তমহীন।

জাহাজ রপ্তানি করে এবার প্রচণ্ড পবিত্রতা
পুণ্যচ্ছায়াহীন দ্বীপে, অবনত খৃষ্টান-নগরে—
আমি ইঁদুরের মতো চোখের আড়াল আত্মসাৎ
ক'রে ঢুকে গেছি ডেক্-এ, বস্তায় ও তুমুল আঁধারে
এবং আমিও চাই চোরাচালানের ওতপ্রোত
আমার বিদায় হোক গর্তে, কোনো সিংহাসনে নয়—
মানুষের হৃদয়ের অহরহ প্রকৃত শূন্যতা
ভ'রে দুই ডানা মেলে উড়ে যাওয়া হয় না সঙ্গত ?
চালানি জাহাজ থেকে ঝরে যায় গোপন চালান
অভিসন্ধিমূলময় মানুষের প্রাণের জিজ্ঞাসা
তৃপ্ত হবে বলে এই ঘুরপথে জাহাজের আসা।
অশ্রুঅক্ষরেখা-ব্যাপ্ত অশ্বের আবিল জাগরণ
মনে পড়ে যায়, যায় কত ক্রীতদাস দেশান্তরে
ইঁদুর, প্লাবন-স্ফীত আকাশের মেঘ ফুটো করে।

তোমার সংকেত শুধু তুমি জানো, হে অনন্যমনা
জাহাজে এসেছে শিশু, জাহাজেই ফিরে চলে যাবে
বাকি শুধু বাজা বাঁশি, অমরসংগীত বারংবার
তারপর স্তব্ধতায় ক্রমাগত দিবস ফুরাবে।
আমি জানিব না প্রিয়, আমি দেখিব না শিশুটিরে
শুধাবো না, অতগুলি ময়ূরের মাঝে পরাক্রম
তোমার কি অবিনাশী? শুধাবো না, যাবে না সমীরে?
শুধাবো, হে শিশু তুমি কার প্রিয়, কার বা সন্ন্যাস!
তোমার সংকেত শুধু তুমি জানো, হে অনন্যমনা
আমিও জানি না। জানি কায়মনোবাক্যের বিচ্যুত
কয়েকটি নির্দেশ, সুধাসমর্পণ, কিছুবা করুণা
আর কিছু জানি না হে, কিছু আর জানিতে চাহি না
কে ডাকে প্রিয়ের প্রিয়, অতিনব, মম ওতপ্রোত?
আততায়ী শিশু তুমি রেখো গেছো আমারই সকাশে!

জানালার প্রান্তে ভয়। জানালার প্রান্তে বসোনাকো
দেখো না বাহিরে দূরে বনস্থল সহজে বিলায়
সুদূর মাধুর্য তার। ভয়, পাছে তুমি যেতে থাকো
ওই নিবেদনে বহে—বৈরাগীর সংগীতে-সন্ধ্যায়।
যে যেতে নাচার, তাকে পথে টানে ঐ শোভাধারা
টানে ও সরিয়ে দেয় স্ববিরোধী স্রোতের পশ্চিমে
আঁধার ও অন্ধকার মুহুর্মুহু চুম্বনে কিনারা
ভরে দিতে থাকে যবে সনির্বন্ধচিত্ত কাঁপে হিমে।
জানালার প্রান্তে বসে তোমারই একদা মনে হবে
ওই তীব্র চমৎকার কুয়াশায় ভাসানো জাহাজ
তোমাকেই ডেকে যাচ্ছে, তোমাকেই করে যাচ্ছে ঋণী
জানালার প্রান্তে বসে ভয় করে যথার্থই আজ
অপমানাহত তুমি ফিরে এলে, তবে কি স্বৈরিণী ?
ভয় করে, মনে হয়— গৌরবের অপচয় হবে।

এখনো যায়নি বেলা, হাওয়া দেয় পশ্চিমা-তুফানি
এ বন্দর ছেড়ে গেলে বন্দর পাবে না বহুদিন
গেলে কি জাহাজ? ঘাট ছেড়ে গেলে এখনো তো জানি
আমারে জানাবে, যাই। বেলা হলো চপলতাহীন।
কোনোখানে বেলা যায়, কোনোখানে বেলা ফিরে আসে
ছায়ায়—কপোলতলে ভাগ্য খেলা করে মুহুর্মুহু
কোমল বলের মতো শৈশব জড়িয়ে থাকে ঘাসে
বন্দরে, জাহাজঘাটে মানবিক বিদায় মিহিন!
বন্দরের মাঝখানে ঘনবদ্ধ কাঠামো-বেষ্টিত
দুর্দান্ত জাহাজ আছে কোনো এক— তোমার চেহারা
ওই জাহাজের মতো হয়ে গেছে। বহুদিন পরে
আ-পরিপ্রেক্ষিত প্রেম কেঁপে ওঠো, হও রোমাঞ্চিত।
বহুদিন পরে ব'লে মনে হয় তুমিই জাহাজ
বন্দরে, জাহাজঘাটে প্রেত হয়ে বিচরণ করো!

৫০

আমার আত্মার ক্লান্তি দিতে পেরেছিলাম তোমায়
হে জাহাজ ক্লান্তিহীন, হে জাহাজ অনুধাবনীয়
প্রকৃত প্রসঙ্গহীন, হে জাহাজ তোমারই মায়ায়
কাটাবো এ-মনঃপ্রাণ— তুমি এসে বিবরণ দিও :
কতগুলি দ্বীপ ফেলে গেছো পাশে, কত মায়াবিনী
বঞ্চিত পাখির উড়ো দল মাঝে স্ফুরিত ঢেউয়ের
আত্মনিবেদন, হায় হে জাহাজ তোমারে ফাল্গুনী
আশা করে, ভয় হবে, হে জাহাজ স্ফুরিত ঢেউয়ের
আত্মনিবেদনহীন অভিব্যক্তি বিদায় জানায়
হে বন্ধু, প্রাণের প্রিয় কোনোদিন দেখিনি জোয়ারে
অসংখ্য বরফকুঁচি ছুটে আসে নিষিদ্ধ খানায়
দূর করে মুহ্যমান অপদস্থ প্রবল গোঁয়ারে।
ক্লান্তি সঁপে দিতে পারি তোমাকেই— তোমার কামান
ডাকে মুহুর্মুহু প্রেত, অশ্রুপাতবদ্ধ পদতলে।

নিশ্চিত উঠানে যেতে ভয় পাও। আকাশের খোলা
হিংস্র মুখ থেকে ছিটকে পড়ে নীল তারকা-খচিত
উর্ণাজাল। ভয় পাও— এতো কি সহজ প্রিয় ভোলা ?
সীমাবদ্ধতাই সব, প্রাণপণ প্রেম সমাহিত।
আমিও সমাধি, পূর্ণ প্রোথিত— শয়ান নয় স্নেহে
বরং চপেটাঘাতে, খোঁচা খেয়ে মরেছি দৈবাৎ
হে মৃত্যু, হে কিশলয়, জেগেছিলে তুমিও সন্দেহে
মহিলার মতো হায় পুরুষেরে করেছিলে হাত !
রাতের উঠানগুলি বেলফুলমালার মতন
ক্রমক্ষীয়মাণময়, শেষবার তার স্পর্শাতীত
সুবাস মুঠায় ধরে তন্দ্রাহারা ম্লান বারাঙ্গনা—
ফেরে পদচ্ছাপ মেখে দেহপরবশ অভাজন !
নিশ্চিত উঠানে যেতে ভয় পাও—কতো ফুলমালা
শেষের সুবাস তার করে গেছে আকাশে দ্যোতিত।

অস্তিত্ব, অতিথি তুমি—দিনেরাতে বারংবার নও
একবার জেগে ওঠো অকস্মাৎ : ঘণ্টা বাজে দূরে
ধর্মের দীনতা আজো দণ্ডিতেরে করে না নির্ভয়
মানুষে বাঁচাও তুমি, হে অস্তিত্ব, চকিত নূপুরে।
ছায়ার চেয়েও বেশি, তুমি তার অন্তরে রক্তিম
রক্তের সহস্র আঁখি পুঞ্জ-করা—অনুভাবনীয়
হৃদয় একটিবার, পাতার অধিক নীল শিম
সচ্চাষী কুমারীর ফেঁপে-ওঠা কোঁচড়ের প্রিয়।
আমাদের শহরের সব কটি নিরস্তিত্ব প্রাণ
তোমার প্রয়াণপথ লক্ষ্য করে—তালিবন দিয়ে
তুমি গেছো, হায় তুমি, দীর্ঘকায় আসল মানুষ !
আমি যদি গান গাই ছায়া পড়ে রক্তের ভিতরে
যদিও কালের কাছে সমান্তর প্রসার তোমার
ভরসা করে না প্রাণ, স্থির জানে—তুমি ডুবে যাবে

মানুষের পাশে দেখি শুয়ে আছে প্রিয় মানুষের
সমাধি—সবার কাছে পরপার অঙ্গাঙ্গী এমন !
অসংসক্ত, স্বাভাবিক মানুষ দেখেছি আমি ঢের
সুখী মানুষেরে আমি দেখে গেছি অনেক, জীবনে।
সকল মানুষ দৃঢ়চিত্ত নয়, কিন্তু ছায়াবাদী
আয়নায়, জলের প্রান্তে তার স্বতোৎসার ছায়াময়
কাঠামো, শৌখিন ফোটো দেখেছি কেমন ভালোবাসে
শতাব্দীতে একবার ধুয়ে দেয় সমাধি, সময়।
সেই সব সমাধির ধোয়া জলে আমার জাহাজ
ভেসে গেছে। জল ছাড়া অতিরিক্ত তাদেরও অস্তিত্ব
কেন্দ্র ক'রে, শতাব্দীতে একবার আমার জাহাজ
সামগ্রীর লোভে নয়, লোকান্তর সুখ-ভোগে নয়
দ্রু-রূপ খুশিতে মেতে ভেসে গেছে চির পরপারে—
সেইসব সমাধির ধোয়া জলই আমার জাহাজ !

৫৪

জাহাজে উঠেই জানি ভুলে যাবো, আমায় মানুষ
ভালোবাসা জানানোর জন্যে সারিবদ্ধভাবে নয়
একা একা এসেছিলো। মূঢ়তা, আমার ছিলো ভয়—
জাহাজে ওঠার আগে সম্মুখীন হইনি জনান্তিকে।
আন্তর্জাতিকতা নিয়ে আলোচনা করে সম্মিলন
ব্যক্তিগত কথা নয়, ব্যক্তির সমষ্টি নিয়ে কথা—
বলে ওরা, তবু হয় বস্তির উপরে লোষ্ট্রপাত
ইঙ্গিত অতল করে পেটি-বাবুয়ানি অশ্লীলতা।
সারিবদ্ধভাবে আমি মানুষের ভালোবাসা পাই
সমস্ত স্টেশন, গুম্‌টি, লোকালয় এবং ময়দানে—
মনুষ্যত্বে ওতপ্রোত ছিলো সব, পৃথিবীর ধূলি
ভারি প্রিয় ছিলো আহা, একাকী কিছুই আসে নাই
সারিবদ্ধভাবে ছাড়া কোনো বন্ধু আসেনি একাকী,
কোনোমাত্র রমণীর পাইনি একাকী আলিঙ্গন!

৫৫

একটি জাহাজ শুধু স্রোতে নয়, সতর্কতা থেকে
মাটির প্রান্তের দিকে একদিন সরে এসেছিলো
অথচ যন্ত্রের কোনো মন নেই, অভীপ্সাও নেই
আমরা মানুষ যেন সব জানি, জানি না ডিমেলো
ভারতের ক্রিকেটের কতবড় উদ্গাতা ছিলেন !
তাহলে জাহাজে কোনো যন্ত্র নেই, কুশলতা নেই
আছে মানুষের চিৎ-সাঁতারের মনোবাঞ্ছারাশি
বিশাল মানুষ নাকি হে জাহাজ ?   নীল অহিফেন
থেকে, পারহীন থেকে, ক্রমাগত ভেসে আসা পারে ?
আমরা মানুষ হয়ে জাহাজে দূরে যেতে চাই
কাপ্টেন ভজিয়ে খুব, কানে কানে ব'লে মিথ্যাকথা—
এদেশে কি পাবে শান্তি ?   শান্তিনিকেতন পরপারে—
এবং তুমুল স্তব্ধ জালাতন নেই, প্রেম নেই,
সকলে, মানুষ নয়, গণ্ডারের চামড়া ভালোবাসে !

অদ্ভুত জাহাজ ভেসে যেতে পারে আরবের জলে
সাবলীলভাবে নয়, মানুষের নিযুক্ত মেধায়।
আত্মবিশ্বাসের মতো গালাগাল ভূ-ভারতে নেই,
অ্যাপোলোর মন্দিরের উজ্জ্বলতা স্বগত মার্বেলে!
বিপুল জাহাজ ভেসে যায় আজ আরবের জলে
ক্রীটের দ্বীপের মাছ, পৌরাণিকতার কানাকানি
আমাদের বলেনাকো, যেহেতু সভ্যতা ফেঁসে যায়—
কাঁটায় ফোটানো বস্ত্রে ন্যাংটো দুই স্ত্রীলোকের পাণি।
স্তব্ধ হয়ে যাই যবে মধ্যরাতে কবিত্ব দাঁড়ায়
জানালার প্রান্তে এসে; বলি, যে-জাহাজে ছিলে তুমি
সে কি তবে ডুবে গেছে সাংঘাতিক আরবের জলে?
আরবের জল ব'লে কিছু নেই, এই সভ্যতায়
আমি কি একাকী জানি এইসব? পরিদৃশ্যমান
কেবল জানালা প্রান্তে পড়ে থাকে বিদেশের ছায়া।

৫৭

এখন জাহাজ ছেড়ে যায় বন্দরের পাশ থেকে
বন্দরের থেকে নয়, হিসাব-নিকাশ থেকে নয়—
অসংখ্য জাহাজ ছেড়ে যায় মুহুর্মুহু কারে ডেকে
মানুষে না ডেকে শুধু সরে যায় জলভূমিময়।
যাবার বেলায় ঐ পাশে-থাকা আঘাটা তোমারও
হে মানুষ, জীবজন্তু! তুমি ফেলে যাও অভিনব
হিসাবের পাতাগুলি, ফাঁকা ঘরে-বন্দরে। হোমারও
তোমার হিসাব থেকে গড়েছেন ওদিসি-সম্ভব।
এখন জাহাজ ছেড়ে যায় বন্দরের পাশ থেকে
এখন নিয়ম ক'রে রক্ষণশীলতা পৃথিবীর
বহুদেশে বন্ধ আছে, বহুদেশে নূতন সাহস
সম্পূর্ণ নূতনভাবে শুরু হয় কুজ্‌ঝটিকা থেকে—
প্রাণ, প্রেম, প্রভাতের মনস্বিনী আলোর মঞ্জরী
যখন জাহাজ ছেড়ে যায় বন্দরের পাশ থেকে।

আমার হৃদয়ে আজ কোনরূপ নির্জনতা নেই
তোমরা এসেছো ব'লে আমি জনসভার মতন
এখানে, মাঠের ধারে বসে আছি। আজ সম্মুখেই
আমারও ভিতরে হয় কলরব স্বদেশাভিমুখী।
সকল দেশের সিংহাসনতলে রয়েছে বিড়াল
আমি জানি, ইতিহাস বই-এর উৎক্ষিপ্ত পাতাগুলি
এ ওর মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে অপস্হয়মান
হবে আরবের জলে, হৃদয়ের শ্রান্ত পাতাগুলি।
মানুষের মতো গ্রন্থ নেই কোনো। তবুও মানুষ
ব্যর্থ প্রাণহীন সব লাইব্রেরিতে অকাট বিশ্বাসে
বসে আছে হাতে-ধরা ছাড়পত্র প্রবেশকারীর!
ওরা, যারা ফিরে যায় ছত্রভঙ্গ, কিউ-র উদ্ধার
পাবে নাকি আজ নিজ ঘরবাড়ি, ছাদের ফানুশ
ম্লান মত্ততায় ডুবে ওরা নাকি দৈনিক রাঁড়ির?

৫৯

এতো অপমান করো তবু কেন রয়ে যেতে চাই
তোমার প্রচ্ছায়ে প্রিয় ? হয়তো আষাঢ় গেছে থামি
নির্জন কান্তারে আজ। জন্ম দেয় গাভী তিক্ত যীশু
শতাব্দীতে একবার আপাদমস্তক হতে নামি
তোমার চুম্বন পাই শেষরাতে বিদায়ের আগে।
এখনই বিদায়, একি ! হাঁটু পেতে ভূমির উপর
নিরবলম্বনে আমি বসে আছি, সহ্যহীন রাগে
তোমার সুষমা ফেটে পড়ে ঘরে কম্পন-তৎপর।
আমি মাঝে-মাঝে ভালোবাসি, যারা সকল সময়
ভালোবাসা দিতে পারে, দিক তারা। নেমেছে আষাঢ়
নির্জন কান্তারে আজ। সৃষ্টিতে কি গাঢ় অবক্ষয়
হয়েছে উপর্যুপরি ? মানুষেরা পৃথিবীর ধার
দিয়ে হেঁটে দূরে অধিত্যকাদেশে হয়েছে বিস্মৃত
প্রিয়ের কথাও ! আমি মানুষ কি বিষাদ-প্রসূত ?

আজিকে মানুষ বড়ো ভালো লাগে, এই লোকালয়
ছেড়ে আমি দূরে যাবো কখনো কি ? সকল প্রবাসে
দালান কোঠার 'পরে জমে গেছে সংঘবদ্ধ ঘাস
আজিকে মানুষ বড়ো ভালো লাগে, বনভূমি নয়।
কারা বনভূমি হতে ফিরে আসে মানুষের পাশে
এবার দাঁড়াবে ব'লে বাঘ-বল্লাহরিণ-খরিশ—
কারা মানুষের ঘরে স্বত্বাধিকারীর বিশ্বাসে
এসে যায়, ভাড়াটিয়া নয় ব'লে সত্তার হদিশ
পায় কেউ কেউ, তাই ছেড়ে দেয় সার্ধ লোকালয়
আদি মালিকানদের—মানুষ ওদেরই ভালোবাসে।
এই লোকালয় ছেড়ে পারি আমি যেতে আজ কখনো কি ?
আমি কি বাসি নি ভালো কিছু আজও ? অনেক সময়
দিয়েছি তোমার পায়ে হাত পেতে সত্য ও আভাসে
আমার যা কিছু ছিলো, বনময় প্রচণ্ড কেতকী।

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা ঘাসের মতন
শিশিরে, চপেটাঘাতে, কিংবা ঝাউবন চূর্ণকরা
হাওয়ায় জাগিনি আগে ভোরবেলা, কখনো এমন
জাগিনি, আমার চিত্ত চিরকাল ছিলো জয়করা
বিকালবেলার। আমি মাঝরাতে ঘুরেছি বাগানে।
একি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়—
জন্ম কি এমনই ভালো? সন্ধ্যা হতে দেয় না সেখানে
অহংকার আলো ক'রে রেখে দেয় মলিন জামায়।
কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা, না জাগিলে আর
কেমনে পেতাম ঘাসে শিশিরের নৈঃশব্দ্যে করুণা
অবিরাম বুকে হেঁটে পার হওয়া—জীবনে পাহাড়
বাঘেরও অসাধ্য, আমি বাঘ হতে বড়ো জন্তু কিনা!
এ কি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়
এ কি এ একাকী জন্ম ভোরবেলা উজ্জ্বল জামায়।

৬২

আমার বেদনাময় বাংলা ভাষা যদি বিদ্ধ করে
নির্মলতা-হারা প্রাণ, তবে পূর্বে প্রণতি-স্বীকার।
ভালো নির্মলতা, ভালো শান্তি—জানি সুখের কদরে
আয়ু দীর্ঘতর হতো, হতো স্নিগ্ধ বারি দীর্ঘিকার।
আমার বেদনাময় বাংলাভাষা যদি বিদ্ধ করে
অজেয় অমর শ্বেতপাতার প্রচ্ছন্ন জাগরণ
সেকি নয় স্বর্গচ্যুত মন্দার সহসা বুকে ধ'রে
স্পর্শে প্রতারিত হওয়া? তাকি নয় নিশ্চিন্তে মরণ?
তবুও স্বর্গের মতো কিছু নেই, যা থেকে পতন
হবে অধোভূমে, কিংবা পাতালের প্রচণ্ড গহ্বরে
মর্ত্যের দণ্ডিত মর্ত্যে পড়ে থাকে অভ্যর্থনাহীন;
আমার বেদনাময় বাংলাভাষা তাকে বিদ্ধ করে।
তোমাদের দরজা-জানলা ফুটোফাটা বন্ধ ক'রে দাও
ফুলের বাগানে ভূত মারাত্মক প্রস্রাব ছিটোয়।

ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো
যেদিকে দুচোখ যায়—যেতে তার খুশি লাগে খুব।
ভালোবাসা পেলে আমি কেন আর পায়সান্ন খাবো
যা খায় গরিবে, তাই খাবো বহুদিন যত্ন ক'রে ।
ভালোবাসা পেলে আমি গায়ের সমস্ত মুগ্ধকারী
আবরণ খুলে ফেলে দৌড়-ঝাঁপ করবো কড়া রোদে
'উল্লুক' আমায় বলবে—প্রসন্নতাপিয়াসী ভিখারী—
চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয়, লাথি মারবো পোঁদে।
ভালোবাসা পেলে জানি সব হবে। না পেলে তোমায়
আমি কি বোকার মত বসে থাকবো, চিৎকার করবো না,
হৈ হৈ করবো না, শুধু বসে থাকবো জব্দ অভিমানে ?
ভালোবাসা না পেলে কি আমার এমনি দিন যাবে
চোরের মতন, কিংবা হাহাকারে সোচ্চার, বিমনা—
আমি কি ভীষণভাবে তাকে চাই, ভালোবাসা জানে।

দিনের দুয়ার আজো খোলা দেখি। রাতের দুয়ার
বন্ধ, বহুদিন বন্ধ। আমার স্থান কি খরতাপে?
আমার কি স্থান আছে পৃথিবীর সমূহ সন্তাপে
অশ্রুর সামনে কিংবা বেগবান বিপুল জোয়ারে?
দিনের দুয়ার আজো খোলা দেখি। রাতের দুয়ার
বন্ধ, বহুদিন বন্ধ। আমার মানে কি উজ্জ্বলতা?
আমার মানে কি হবে নীরবের সারাৎসার কথা
কি দিন কি রাত্রি লাগে অন্ধতায় অথবা শুয়ারে?
তোমার নিকটে ছিলো একটি দুটি আলোকবর্তিকা
তা, মই লাগিয়ে কোন বাতিঅলা অকম্প ফুৎকারে
সময়ে নিভায়ে গেছে, এমন সময় কারো শিখা
নয়, উজ্জ্বলতা নয়,—নিষ্কাম গাধার মতো ঘাড়ে
বালুকার রাশি বহে বালুকায় মিশাতে চলেছি—
এই অন্ধকার নাকি সকল-আঁধার-খসে-পড়া?

এমনি দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো। এমনি দিনেই শুধু তুমি
প্রতিজ্ঞার চেয়ে বড়ো করাহত কপালেরে চুমি
আমারই নিমিত্ত! যেন এতদিনে গভীরে নামার
পথ বলে দিলে, আমি নেমে গেলাম সংশয় না রেখে।
এমনি দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো। মুখ ঢেকে আস্তিনে জামার
চলছিলাম সমস্তক্ষণ, বিষণ্ণতা মানে না চিবুকে—
স্বাভাবিকতাই ভালো। মূর্তি মম সর্বস্ব আঁধারে
খেতে চায় এ সামান্য ছায়ার সরিয়ে স্থজ্‌নিখানি
স্থির রসাতলে, যেথা সাংঘাতিক শৈত্যে-হাহাকারে
সব অন্ধকার, বন্ধ, রন্ধ্রে লোল পাপাত্মা সাবধানি।
এমন দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো—প্রয়োজন গভীরে নামার!

এবার আমার ছুটি, তুমি ফুটে উঠেছো শেফালি
বৃন্তে-বৃন্তে রোমে-রোমে ঐ শক্ত নিগূঢ় হলুদ
জানো কার ? ও শেফালি, জানো কার সঞ্চয়িত খুঁদ
তোমাকে দিলাম ? হলো অকিঞ্চনে দিতে বুক খালি।
জগতে উদ্ধার বড়ো বেশি নেই, আরো শক্ত দেওয়া—
যা ফিরে পাবো না আমি গাছ হতে, পাতা হতে প্রাণ
স্মৃতিরে কুড়ায়ে লয়ে যেতে পারি, স্বতঃই সন্ধান
জাগিয়েছি জেনে, এই অধিকারে, হাত পেতে নেওয়া
যখন আমার ছুটি তখন কি তুমিও শেফালি
ফুটেছিলে ? ও শেফালি, তখনও কি বৃন্তের হলুদ
উপহৃত হয় কোনো প্রেমাভিমানীর বক্ষ চিরে ?
ঈর্ষা না; সংবাদ দাও, হ'লে বুক দাহ্য, হ'লে কালি
বেঁচে যেতাম। এই শান্তি পুড়ে যায় যখনি শিশিরে
তখন আমার দান, বলো আজ হতো কি অদ্ভুত ?

ভালোলাগার আদরে তুমি জাগো না নীরবে
আমি দেখি। ভেসে ওঠে পরিপূর্ণ তীব্র কলকাতায়
অধঃপতনের ধ্বনি, তবু বুকে, শান্তিতে, পাতায়
তোমার, বৃষ্টির মতো ঝরে-পড়া ফলবতী হবে।
না, আমি যাবো না ফেলে পড়ন্ত বেলার জাগরণে—
সন্ধ্যা নামছে। বহুদিন পরে যেন মৃত্যু থেকে দূর
তোমায় দেখলাম, হোক মেঘ-ভাঙা আলোক বিধুর
তবু যা আলোক নয়, স্মৃতি, তাকে স্পর্শ করে মনে।
বস্তুত, পায়ের মাঝে ঢেলে দিলে জাগ্রত দ্যুতিরে
এ-মুখমণ্ডল হতে শুষে নিলে মালিন্য আমার
তুব্‌ড়ে গেলো নৈরাশার অননুমোদিত নিমগ্নতা—
তবু কি পেলাম, যাকে লোকে বলে অপর্ণা তিমিরে
পাওয়া স্বতোজ্জ্বল ? যার স্পর্শ পেলে নরকে নামার
সিঁড়ি হবে সাবলীল, স্বর্গ হবে প্রশস্ত দরোজা !

এ কি আলিঙ্গন ? এ যে ওতপ্রোত গ্রাসের গঠন
পদতল-মধ্য-মাথা তাল ক'রে ওষ্ঠ পেতে দেওয়া
খেতে ও খাওয়াতে। এ কি তামসিক কলঙ্কমোক্ষণ
নিষ্প্রভ প্রাণের, এ কি বদ্ধমূল স্ববিরোধী খেয়া ?
এবার চুরমার ক'রে দেবে দাও কান্তি-সভ্যতার
প্রয়োগনৈপুণ্য, ধর্ম ; ধর্ম অনুসারে শিল্পরীতি
বাক্ ও মুমুক্ষা—পরিপুষ্ট কোষে মূর্খ জ্ঞানভার
সমস্ত চুরমার ক'রে দিতে বক্ষে খাক্ করো প্রীতি।
এ কি আলিঙ্গন ? এ কি সভ্যতার জড়ানো চণ্ডালে
আশিরগোড়ালিনখ ! এ কি আলিঙ্গন মানুষের
ঘোরতর, ব্যবধান গ্রাসচ্ছলনার অন্তরালে
অনৈসর্গিক কাম, এ কি জীবনের চেয়ে ঢের
কাঙ্ক্ষিত শিল্পের কাছে ? শিল্প কি বিমূঢ়
অনাসৃষ্টি আলিঙ্গন, সাংঘাতিক পুরুষে-পুরুষে ?

একবার অন্তত অধঃপতনের স্পর্ধায়-গ্লানিতে
শুয়ে থাকতে দাও সারাদিন, যাতে আলো থেকে উঠে
সরাসরি যেতে পারি চূড়ান্ত নরকে। বিষে ফুটে
রয়েছে পাথর, খুঁড়ে গর্ত দেখি কাঁথা ও কানিতে
জড়ানো রয়েছো তুমি—হাড় থেকে খসে গেছে খেদ
কেবল গলার কাছে অপরূপ হত্যার অনল
আজো জলছে শান্তভাবে, পুনর্বার প্রয়াস নিষ্ফল
এ-হত্যা হয়েছে আগে—মৃতদেহে পাপ বক্ষোভেদ।
একবার অন্তত অধঃপতনের স্পর্ধায়-গ্লানিতে
শুয়ে থাকতে দাও সারাদিন, যাতে আলো থেকে উঠে
সরাসরি যেতে পারি চূড়ান্ত নরকে। করপুটে
কোদাল, ফুলের লতা ; শিকড়েও পায় না জানিতে
আমি ভালোবাসতাম, সে-ভালোবাসার আচ্ছাদনে
তোমায় করেছি হত্যা ; ভয়, পাছে জেগেছো গোপনে !

তোমারে আবহমান কাল থেকে চেয়েছি জানাতে
আমি ভালোবাসি, আমি সব চেয়ে তোমারই অধীন—
রটেছে, শুনেছো কানে—প্রবঞ্চনা, চাতুরি ও হীন
নিশ্চিত শঠতা কতো। আদালতে বোবা ও কানাতে
সাক্ষ্য দেয়, কাজি শুধু এ-পাপের শাস্তি মরে খুঁজে,
পাপীর প্রতিভা চায় মুক্তি—আমি মুক্ত মানে বুঝি
তোমার বুকের পরে বসে-থাকা, গায়ে থাবা গুঁজি
তোমারে জাগাতে যেন কুমোরের মতন গম্বুজে।
জগতে সমস্ত সৃষ্টি ওতপ্রোত মিথ্যা ও ব্যর্থতা
তুমি ছাড়া দয়াময়ি! যুক্ত করো কণ্ঠ ও গরাদে
ফাঁস-মফ্‌চেনে, আমি স্বরাজের মর্মের বক্রতা
মানে বুঝি পরিত্যাগ তোমার শাসাতে আমি বাদে
এগিয়ে আসে না কেউ—এমনকি ভিক্ষুক সভয়ে
পার হয় খোলা-দরজা যাজ্ঞাহীন, বদ্ধ করতাল।

৭১

সন্ধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় রৌদ্র হতে খসে-পড়া
সাতটি রুপোলি মাছ ঐ জলে—ঝর্ণায়, মিনারে
বিরূপ গাছের ছায়া, মর্ম পাছে মুক্তির কিনারে
না হয় অপেক্ষমান, এ-ক্ষিপ্র মুহূর্তমাঝে গড়া
সেজন্য ভ্রূকুটি এতো। শ্বেত, মানে ঘনান্ধ কারার
স্বাধীন স্বগত দংষ্ট্রা। সন্ধ্যা সে কি নেয় না তোমাকে,
শ্বেত ও আঁধারে মেশা উপদ্রব! প্রতিরুদ্ধ পাকে
সাপের ফণার মতো স্থপ্যমান জগৎসংসার।
সন্ধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় রৌদ্র হতে খসে-পড়া
সাতটি রুপোলি মাছ ঐ জলে। বুঝি সরাসরি
জীবনের সাত দ্যুতি একদিন স্তম্ভিত ধারায়
মিশে যাবে, কিয়দ্দূর দেহ দিলে শান্ত গড়াগড়ি
সন্ধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় রৌদ্র হতে খসে-পড়া
সাতটি রুপোলি মাছ ঐ জলে, ঝর্ণায়, মিনারে।

৭২

আজ সাধ্যাতীত ভালোবাসবো ব'লে সকাল আমার
এতো ভালো লাগে, এতো সুন্দর, আলস্যভরা বায়ু
ঘর না বাহির, নাকি ঊর্ণাময় স্বপ্নের ফোয়ারা—
আমি বসে আছি, আমি শুয়ে আছি চারিদিকে কার
পশ্চাতে পাঠানো শান্তি লেগে গেছে ভালোবাসবো ব'লে
আমি ভালোবাসবো, আমি হৈ হৈ করবো সারাদিন।
একবার মাঠের পাশে শুয়ে দেখছি প্রতিভা তোমার
ওদের খেলায় ব্যস্ত। দুঃখ হলে সংক্ষিপ্ত শহরে
কাকে বলবো, কথা দাও—দেড় হাজার চুম্বনের কম
এ-দুঃখ যাবার নয়, কাকে বলবো গান ধরো জোরে ?
অর্থাৎ স্বীকার করো, আনন্দে-আনন্দে সারাদিন
কাটতে পারতো, কাকে বলবো—নচেৎ হেমন্তে বেলা যেতো ?
প্রেমেও কি শান্তি পাই পরস্পর—শান্তি কোলাহলে
আজ সাধ্যাতীত ভালোবাসবো ব'লে সহসা সকালে।

এখনো যায় না ভোলা, জ্যোৎস্নায় আঁধারে মনে পড়ে
মনে পড়ে হৃদয়ের চলচ্ছক্তিহীন রক্তে-জলে
তোমারই পায়ের ছাপ, যেন কুণ্ঠা-জড়ানো চত্বলে
ধারার দ্যোতনা তুমি, তুমি প্রাণ, উচ্ছন্ন শিখরে
স্মৃতির প্রাক্তন হাসি গানে-মেশা, গন্ধে উতরোল
গাছের শিবিরতলে বসে কোন্ স্থগিত যুদ্ধের,
সূচনা দেখেছো তুমি, আজ তারই সূত্রপাতে ঢের
সময় গিয়েছে—যুদ্ধ, পাপ, নরহত্যাই সম্বল।
এখনো যায় না ভোলা, মানুষের সৌন্দর্য-সুষমা
চূড়ান্ত দেখেও ভোলা যায় না যা মানুষই দেখেছে
কিছুতে যায় না ভোলা, জ্যোৎস্নায়-আঁধারে মনে পড়ে
তোমার মুখশ্রী, শান্ত আভাময় স্নিগ্ধ শ্যামলিমা ;
কে তুমি ? জানি না স্থির—স্বপ্নস্বরূপিণী শ্যামচ্ছায়া
হৃদয়ে আমার, বাংলাদেশে শান্তি সমর্পণ করে।

৭৪

হাতে ধ'রে শিখায়েছো বালুকায় হাঁটিব কেমনে
দয়াময় ! শেফালির ফুলে ও পাতায় ভ'রে আছো—
কোমলতা দেখে দেখে চোখগুলি হয়েছে কঠোর
যা ধরা দেবে না তারে ধরিব না, দেখিতে থাকিব
ফলের স্বকীয় রসে কেমন শৌখিন হয় বেলা
নগ্ন নারী-পুরুষের মতো হয়ে যায় অকাতর
দিতে কোনো শ্রদ্ধা নেই, নেবারও দীনতা যথাযথ—
হাতে ধ'রে শিখায়েছো বালুকায় হাঁটিব কেমনে ?
হাঁটিতে শিখেছি সেই কবে থেকে, এখনো তোমার
হাতখানি ধরা চাই, বুঝে নেওয়া চাই—বুঝিব না
কিছুই ব্যতীত তুমি, এ কি অবলম্বনের ঘোর
এ কি পিতৃপরিচয় ? ছিলো মোর নিযুক্ত বাসনা—
একাকী বাসিব ভালো, একাকী মরিব, সে-ও ভালো
তুমি আসি বামনেরে উপযুক্ততায় তুলে ধরো ।

৭৫

কমলালেবুর প্রতি যাওয়া ভালো। বহুদূর হতে
উহাদের ব্যবসায় শুরু হয়—ক্রমশ মেধায়
রক্তের চাপের ফলে তালকানা-হওয়া থেকে ওই
কমলাফলের হেতু ভেসে উঠি, জরোভাব কাটে।
কমলা এগিয়ে আসে—ব্যবধান ঘুচে যেতে থাকে,
প্রধান অরুচি, তৃষ্ণা অনুভব করেছে কমলা
মানুষের, যেন তার রূপ কোনোমতে নক্ষত্রের
শোভার আধেকশায়ী, আধেক শিল্পের আস্বাদন।
একভাবে কমলার হেতু হতে চেয়েছে কবির
জিহ্বা ও ব্যক্তিত্ব। তবু ব্যক্তি হতে জিহ্বা বড়ো নয়—
ফানুশ, ফুলের চেয়ে মহত্তর সৌরভ নগরে !
টি টি পড়ে যায়, গাল-গল্পে ফোটে কবির শূন্যতা
যাহাদের স্মৃতি আছে, যাহারা লৌকিক ধ্যানী নয়
তাহাদের প্রতি চেয়ে কমলারা ব্যবসা ফেঁদেছে !

অসীম বস্তুতে ভার, পড়ে আছি সাগরের তীরে
জ্যোৎস্নায় অনেক খেলা হতে থাকে পৃথিবী ব্যাপিয়া
তার আস্বাদন আনো, ও সাগর আনো প্রতিচ্ছবি
একস্থান হতে স্থানান্তরে যায় বিরহ কেবলি।
সহনশীলতা কম হয়ে যায় সামান্য হারালে—
মাধবী সামান্য নয়! আমি প্রলোভন পেতে চাই
সাগরের তীর হতে যেতে চাই সাগরের তীরে ;
অসীম বস্তুর ভার তুলে নিলে অসীম দেবতা।
জ্যোৎস্নায় মাছের খেলা দেখিয়াছি, ফেনার উৎসবে
বহু জলচারিণীর উত্তাল আপেল দেখিয়াছি
পাখি দেখিয়াছি খুব, পাখিদের বাবার মতন
অলৌকিক জেব্রাগুলি দেখিয়াছি, গাছের ভিতরে
ভগবান দেখিয়াছি, ভূতে-পাওয়া বালকের মতো,
কথা কন, তাঁর কথা জ্যোৎস্নায়-সাগরে মিশে যায়।

একটি রুমাল আমি পাই নাই কোনোদিন খুঁজে
মহিলা-যাত্রীদের কামরায় খুঁজিতে উঠেছি
কখনো গিয়েছি ট্রামে কলুটোলা নার্স-কোয়ার্টারে
খুঁজেছি অনেক আমি মানসের বোনের সহিত।
ছাত্রী-নিবাসের কাছে প্রতিদিনই ঘুরিতে গিয়াছি
এমনই মারাত্মক রুমালের স্বার্থে, বিপর্যয়ে
কখনো পড়েছি আমি, কাটিয়ে উঠেছি ফের, তবু
গিয়েছি দোকান হতে দোকানির নিভৃতির কোণে।
বহুদিন বাদে কালই খবর পেয়েছি মধ্যরাতে
ও-প্রান্তে রুমাল শুরু করিয়াছে খুঁজিতে আমায়
পথে নামিয়াছে কিংবা উড়িয়াছে খবর পাই নাই
হায়, ওর খোঁজা হবে মানুষের সাহায্য ব্যতীত!
আমি পুরস্কার ঘুড়ি ফানুশ কতই উড়ায়েছি—
রুমালের কাছাকাছি ঘুরিয়াছি আমিও অনেক।

বারোটি বছর ম্লান কবিতার খাতাখানি খুলে
অনুধাবনীয় আলো অনুধাবনীয় অন্ধকারে
নিরপেক্ষতার সীমা লঙ্ঘন না ক'রে বসেছিলাম—
প্লানচেট্-পাথরে মগ্ন আত্মা এসে বিদায় জানায় :
আমরা মিলনে নয়, বিরহে জমেছি স্বর্গে এসে
হয়তো দেখেছি তাঁকে, হয়তো দেখার তিনি নন
নিকটে দেখেও মনে হয় কবে দূরের বিদেশে
কেবলই দেখেছি তাঁকে গাছে-গাছে কবিতা টাঙাতে।
এবার শরৎকালে মাধবীর কাছে যাওয়া হবে—
মাধবীরও এ-মুহূর্তে মনে পড়ে আমাদের স্থির ;
পৃথিবীর পরিচয়, স্মৃতি ও বিবিধ বিনিময়
এইভাবে ঘটে যায়, কালধারা সুদূরপ্রসারী।
বারোটি বছর ম্লান কবিতার খাতাখানি খুলে
অনুধাবনীয়তার মাঝে বসে আছি, দেখা দাও।

কমলালেবুর মতো আরো একজন খুঁজেছিলো
আমারে বোঝাবে—তারও দূর-হতে-আনা ব্যবসায়,
পারে কি ভজাতে ? শেষে বলে গেলো, আসবে প্রতি সনে
কাশ্মীর গড়িয়ে দিলো এইভাবে পশমের বল।
মনোহরণের মাঝে শারীরিক সমর্পণও আছে
মনের শরীরও কিছু কম নয় ! বেশ্যাবৃত্তি শুধু
শরীর ও রক্ত দিয়ে খালাসের ব্যাপার ব'লেই
প্রচারিত হতে থাকে—একইভাবে প্রচারিত হয়
গোধূলির আলোগুলি, মর্মের চামরীগাইগুলি
অটুট রমণী দেখে একইভাবে রসপাত ঘটে
মেধায় চলে না অঙ্গ-সঞ্চালন কিংবা মুষ্ট্যাঘাত
নির্যাতন চলে জোর মুখশ্রীরে মুখোশ বানাতে
পাংশু ও কর্কশ নখে ছেঁড়া যায় শালের মাফলার—
মাফলার হৃদয় নয়, ভারি নয়, বিবরণহীন।

ধরায়ে দিতেছি প্রাণ মুহুর্মুহু তোমার সংগীতে
লুটায়ে দিতেছি প্রাণ মুহুর্মুহু ; তোমার চরণ
তবু নাহি পাই প্রাণে, দেহের উপরে শত আলো
ঝরিয়া কহিছে : একী জীবনেই মৃত্যু ও মরণ ?
দুইখানি বসিবার আসন পাতিলে একযোগে
কোথায় বসিব ? প্রিয়, প্রিয়তর হৃদয় স্থাপন
তুলনামূলক স্বেচ্ছাচারিতার সমার্থিনী প্রেম
আমাদেরও আছে নাকি ? আমরা কি প্রথমে যেমন
আজিও তেমনি আছি কালের চুক্তির বহিষ্কারে ?
আমরা কি কোনোদিন কুকুরেরও সমান হবো না
আমরা কি কোনোদিন আদুল গায়ের কায়িকতা
নিয়ে চেখে দেখিব না মেয়েমানুষের আশাতীত
রঙিন মলাটগুলি, বগলের নম্র মাংসগুলি
—আমরা এমনভাবে সংগীতে ঢালিয়া দিব প্রাণ ?

এখনো, সুন্দর, তুমি ভুলে আছো আমাকে, স্বভাবে।
ভুলে থাকা একরকম ভালোবাসা, যেন তার কাছে
প্রতিটি বৃক্ষের সত্য ঢাকা পড়ে শান্ত নীলাঞ্জনে—
একত্রে, পার্থক্যে নয়, নয় কিছু স্বাধীন, সোচ্চার
গাঁয়ের নিকোনো বাড়ি, চালচিত্র থাক্‌ প্রাকৃতিক ;
সুন্দরের ভুলে থাকা হবে নাকি সর্বজনপ্রিয় ?
এভাবে, একান্ত ছেড়ে অনেকান্ত সজল বাতাসে
অটুট কবির মতো ভেসে আমি বেড়াবো সন্ধ্যায়—
বেড়াবো কি ? শঠ শব্দ আমাকে বিক্ষিপ্ত করে দেবে
নিতান্ত আলস্যে তার, পশমের শান্তির ভিতর
শীতে ও সম্পদে; তবু কেড়ে নেবে যা কিছু আপন
এই ভেসে-আসা, এই ভালোবাসাসংকুল ধমনী
এবং চুরমার করবে চালচিত্র-নিষ্পন্ন প্রতিমা—
সুন্দরের ভুলে থাকা তবে হবে সর্বজনপ্রিয় !

কখনো যাইনি কাছে, মনে হয় তোমার প্রতিমা
কৃত্তি কুমোরের গড়া, চালচিত্রে আপাদমস্তক
গ্রামের বাংলার ঐ অতসীকুসুমে-ভরা সীমা
তোমার, প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ, নিশ্চিন্ত স্তাবক।
ছেড়ে এলে যে বেদনা, আমি তার অংশীদার নই
অনভিজ্ঞ, দুঃখকে মেলাতে চাই, যদি পাই হেমন্তসংকুল
পরিবেশ ; বুদ্ধি দিয়ে, বিবেচনা দিয়ে—মুগ্ধ হই
স্বপ্নে, বারবার—আমি লক্ষ্য করি, ফুটেছে শিমুল
তোমার দোসর গাছে, শুধু কাছে আসে না প্রতীকে—
আপদ্মামেঘনায় তুমি সুবিস্তৃত, মনে হয়
তোমার প্রতীক তুমি ; খোলামাঠ, শস্যের উজ্জ্বল
গোলা ও নবান্ন আর সচ্ছল জীবন্ত বাংলা ভাষা…
আমি সে-ভাষার জন্যে ঘুরে মরি, শহরে ভিক্ষের
ঝুলি কাঁধে ঝুঁকে-পড়া—পথ আদিগন্ত অবিচল।

স্তব্ধতা বলিতেছিলো : গূঢ়তার প্রশ্রয়ে আবার ;
ভাসিয়া ফিরিতে পারি অথবা ভাসাতে পারি তারে—
স্তব্ধতা বলিতেছিলো : এই সব অতি-আধুনিক
রীতির সাশ্রয়চ্যুত বার্তা ও সংবাদ, বারে-বারে।
স্তব্ধতা কখনো কারে কিছু বলে, অবশিষ্টকাল
প্রকৃতির মতো স্থায়ী পটভূমি সংরচন করে
ফুল-ফল-পর্ব-পাতা মানুষের রায়টাস্‌ মনঃ-
নিযুক্ত ভঙ্গিমা এই সংসারের নিবিড় ভিতরে।
এখন আমারে তুমি ভিক্ষা দাও মত্ত জয়োৎসবে
অমন বিষণ্ণ করি রাখিও না, ভিক্ষা দাও, ঢালো
মুষ্টির অন্তর হতে ভাগ্য ও দয়া ও প্রসন্নতা
আমারে বিষণ্ণ করি রাখিও না নৈরাশা-প্রহৃত
স্তব্ধতা বলিতেছিলো : জয়োৎসব বহিবে বারতা
ভাসিয়া ফিরিতে পারি একদা, ভাসাতে পারি তারে।

একটি গ্রন্থের মতো জানি তারে, বিক্রয়বর্জিত
কবিতার গ্রন্থসম। তথাপি যোগ্যতা বারে-বারে
পুনরভ্যুত্থিত চিত্তে বাগিচার হৈমন্তীলতায়
আনে বিস্ময়ের সেরা স্পন্দন আলোকে-অন্ধকারে
এমন বিশ্বাসময় সুরভিরও এমন আধার
কোনোদিন দেখি নাই—প্রিয় যবে ছিলেন বিদেশ
তখনো ফুলের পাশে বিস্ফোরণ হতো ভ্রমরের
বিদায়, ধ্বংসের মতো মনোমাঝে নিতাম জড়ায়ে।
তোমাদের প্রতিভাত নিশ্চেষ্টতা আমারে সাজায়
অমূলতরুর মতো—ময়ূর বলিয়া পাখি নাই
একদিন জানিয়াছি, ফলেই না ময়ূর সুন্দর !
সেদিকে, সুঠাম সাতটি রাজহাঁস বিপর্যস্ত হ'লে
ময়ূর জাগেন পূর্বতলীয় বনের, সোপানের
বাল্যপ্রিয় বকুলের ছায়ায়, মৃত্যুতে নিষ্ক্রন্দিত।

৮৫

সাবলীলভাবে আমি ভালোবাসা বাসিব তোমারে,
দুটি হাত ধ'রে ধীর কথা যেন কর্ণেরে উন্মুখ
করে, মুখে বোধময় হাসি ও তামাশা একযোগে
উপস্থিত হয় যেন, আঁখির পলক যেন পড়ে,
তুমি তো বাদলে নাই কিংবা বাষ্পহীন কোনো ঘরে;
আছো হে আছোই তুমি স্মরণীয় মাধবীলতায়
অন্য কোনোখানে নাই, যবে আছো আমার সম্মুখে
সাবলীলভাবে আমি রহস্যের অনন্ববর্তিনী।
ভুলে যাও বিকালের আলোগুলি, চামরীগাইগুলি
ভুলে যাও আমাদের সনাক্ত প্রেয়সী, ও সম্বার—
ও সম্বার ভুলে যাও সেই পুরাতন পাখাগুলি
উড়োজাহাজের মতো ঘোড়াগুলি, হাওদায় মাহুত
সব কিছু ভুলে যাও, ও সম্বার ভুলো না আমারে
সাবলীলভাবে আমি সকলেরে বাসিয়াছি ভালো।

সিন্না-র মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী—উইলিয়ম তুমি
কেন ক্রুদ্ধ রোমে তুমি কবিকেও করেছো বাহির ?
ট্রেজন্-মার্ডার-লুট, যে-পথে শ্বাপদ করে ভিড়
সেই-পথে ? উইলিয়ম, তোমাদের একই জন্মভূমি।
তোমার অন্তরে নাট্যশিল্পবোধ কাব্য-ব্যবসায়—
দ্বৈরথে হারালো সিন্না প্রাণ তার প্রণতিবিহ্বল
কবিতার প্রতি ব'লে ? হে প্রতীচী, এতো অবিকল
নাট্য-প্রতিনাট্যবোধ আশা করো প্রাচী-র সন্ধ্যায় ?
কিংবা আত্মনিপীড়ন—হত্যা করো নিজেকে এভাবে
যেহেতু ইংলণ্ড ভিক্ষা করেছিলো আভন্-এর তীর—
ব্যক্তিগত-লেখা তুমি ছেড়ে দিয়ে প্রাণের তিমির
দেখালে রাষ্ট্রের, তা-ও, হে প্রিয়, যথেষ্ট পথ যাবে।
তুমি গ্রীসদেশ, তুমি উইলিয়ম—অনন্যস্মৃতির
দ্বৈপায়ন, তুমি পূজ্য বাংলাদেশে নাট্যের অভাবে।

দাও, বক্ষ দাও, দুগ্ধ পান করি, বালক তোমার
আমি ছাড়া কেহ নাই ; আন্তরিকভাবে সুগঠিত
এমন বাৎসল্য তুমি দেখিবে না অরণ্যে। সোনালি
বাঘের শাবকও চায় রক্তপিত্তকফের সম্ভার !
আমারে ভোলাতে পারো একটিমাত্র ফানুশ উড়ায়ে,
হাতের পেন্সিলে আমি দশবছর আবদ্ধ ছিলাম,
একটি মুখোশ কিনে দিয়ে তুমি গেলে পরবাস,
আমারে ভোলাতে পারো একমাত্র ফানুশ উড়ায়ে !
কখনো যাবো না কাছে, ডাক দিয়ে ফানুশটিই যাবে—
চাই না উত্তর : আমি যা লিখি, উত্তরভরা চিঠি ?
তাই থাকে নিরুত্তর। জানো তো একাকী, দয়াময়,
বাক্-চিত্রহীনতার মাঝে কিছু কবিতা ওঠেন।
এইসবে আছি বেশ, বুক থেকে জিরাফের মতো
মাঝেমাঝে, সে-বুকেরই রক্তাপ্লুত গলা দেখা যায় !

এই সিংহাসন, তার পায়ে বাজ, উড্ডীন ডানায়
আমাকে জড়তা থেকে নিয়ে যায় নক্ষত্রের দেশে—
'নক্ষত্র' অভ্যাসে লিখি, আমার নক্ষত্র এইসব
স্থানীয় গেরস্তঘর, কিংবা দূর কুহকী বাংলোয়···
নিয়ে যায়, ভালোবাসে—ঐ বাজ চাঞ্চল্যে অধীর
হয়ে পড়ে বস্তুভারে, তবু মুক্তি করে না বর্জিত
আপন অন্তর থেকে, ঢেকে রাখে, জানায় না ঘোর
উড়ে-পুড়ে চলে যাওয়া বাসনার মর্মের আত্মজে।
মুক্তি, মুক্তি করে লোক, সব মুক্তি বন্ধনে জড়িত
সাপের আশ্লেষ যেন বিষে ফেটে চৌচির ভুবন—
অমৃতের পাত্র ভাঙা ? কানাতে শিল্পের কারুকাজ
মেখলাস্থনীল মিনে, তার কাছে রাজসিংহাসন !
কিন্তু যেতে হবে দূরে, আত্মপরিচিত পথঘাট,
না গেলে নির্বিঘ্ন হবে প্রিয় যেন প্রোষিতভর্তৃকা।

হয়তো টেবিলে জমে আছে ধুলো—নিবিড় আঁধারে
তাহারে পাব না টের, মনে হয় আরো যাহা আছে
আলো ফিরে এলে সবই দেখা যাবে—এখন পাহাড়ে
ঢেকেছে প্রত্যন্তভূমি—গীর্জাচূড়া জেগে থাকে কাছে।
বিশ্বাসের রীতি এই—যেন টেলিফোনে স্পর্শ পাওয়া
শ্রুতি-ওষ্ঠে যোগাযোগ—দৃষ্টির অতীতও হতে পারে
স্বাদ-গন্ধ-বর্ণহীন, না কি তা সংশ্লিষ্ট স্বর্গে-যাওয়া
প্রকৃত প্রত্যন্তভূমি ঢেকে আছে যদিও পাহাড়ে।
ধুলোয় ক্ষতিও নেই, বৃদ্ধি নেই—সে নয় আপন,
ব্যবহারযোগ্য নয়, খাদ্য নয়—শুধু বিসদৃশ
যেখানে চাঞ্চল্য আছে, ঝাঁটা আছে, দিবসযাপন
সেখানে কীভাবে ধুলো জমে প্রাণপণে, অহর্নিশ ?
আলোকেও জমে ধুলো—অধিকারবোধ আছে তারই
সর্বাঙ্গ আলস্যে ভার, তুমি ধুলো-মুক্ত করো, নারী !

৯০

সোনালি ফলের মতো দিন, তাকে রাত্রি টুকরো করে
শাণিত বঁটিতে, ঐ বারান্দার এককোণে ব'সে
দজ্জাল বিধবা এক, যেন তার হিংসাতে চিক্কুর
দেয় থেকে-থেকে ; আর ফল পোড়ে বিষণ্ণ আক্রোশে।
পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়, ছাই জমে দেয়াল পেরিয়ে—
পাহাড়, অহল্যামূর্তি ; একদিন ঝঞ্ঝা হয় ঘোর,
ওড়ে পুরাতন ছাই, রীতিমতো পাহাড় এড়িয়ে—
কোথায় ? স্বর্গের দিকে এবং পাতালে যায় চোর।
ভাগ্য যেন, কপালে সংকেত রেখে মুখর পবনে
ভেসে চলে দিগ্‌বিদিক, স্বেচ্ছাচারী মান্দাস কলার—
কিংবা বাসি বনগন্ধ বৃষ্টিপাতে হয়েছে বিস্তৃত ;
তেমনি সোনালি ফল, দিনরূপ, পড়ে খড়্গফলা
কর্তৃত্বের কড়া হাতে এবং অখণ্ড বাংলাদেশ
দেহ-মনে টুকরো হয়, টুকরো হয়, টুকরো হতে থাকে !

৯১

ইমারত ধ্বসে গেছে—পড়ে আছে তারই ধুলোবালি
মানুষের মৃত্যু হলে তার ঘরে সে থাকে না খালি
বাকি সকলেই থাকে—যাবার সময় নয় কারো
যাকে ডাকা হলো সে-ই যাবে, শুধু শূন্যতায় গাঢ়
ক্লাসরুম পড়ে থাকে, ঈশান পণ্ডিত মাথা তোলে
বেয়ারার হাত থেকে চিরকুট খসেছে তাঁর কোলে।
'ট্রান্সফার! ট্রান্সফার! আজই ক্লাস ছেড়ে যেতে হবে তোকে'—
ইস্কুলে, খেলার মাঠে সাঁতার কেটেছে দীর্ঘ শোকে
শ্রেণীসঙ্গী তারা, যারা রয়ে গেলো স্তূপের মতন
বেদনার বশবর্তী, কিছু গেলো বাগানে রঙ্গন
তুলতে, কিছু গেলো ঘরে—বাহিরে নিঃসঙ্গ সত্তা ফেলে
ঘরের জনতা তাকে করলে ভোগ, সে নিষ্কৃতি পেলে।
ঘরেরও নিষ্কৃতি নেই, অমরত্ব নেই জনতার—
ঈশান পণ্ডিত থেকে-থেকে বলে 'ট্রান্সফার! ট্রান্সফার!'

৯২

দীর্ঘদিন তার কাছে, ছেলেবেলা থেকে তার কাছে
মানুষ হয়েছি আমি, তার পাঁশ-ঢিবির উপরে
খেলেছি অনেক খেলা, কোষে বিষ করেছি লেহন
মরিনি, শিখেছি বাঁচতে, জিভ দেগে—গেরস্থের ঘরে
মানুষ হয়েছি আমি, একবার মানুষই থাকতে চাই।
ভেঙে টুকরো হতে চাই না, যাতে সে স্বচ্ছন্দে যাবে ভুলে
অর্থাৎ যেতেও পারে ; সে তো নয় দৃষ্টিতে দারুণ
তুখোড় মায়াবী কেউ, অটুট ব্যক্তিত্বে কাছা খুলে
যায় তার, এঁটে রাখে, কোনোমতে ভদ্রতারক্ষাই
জরুরী সমস্যা তার! আমি যে মানুষই থাকতে চাই—
এ তো পাঠশালে শিক্ষা, তারও পরে, ইস্কুলবাড়িতে ;
ভেতরের মনুষ্যত্ব বাইরে থাকে, বাহত ফাঁড়িতে
কাটে দিন। দেয়ালে ঢুকিয়ে সিঁধ, ন্যায়নিষ্ঠ দেশে—
কুকুর-কেত্তনে ভাগ্যি আড়ে ঠেকা দেয় রায়বেঁশে!

সোনালি সুতোর ঋণে পৃথিবীকে দিয়েছো অশেষ
যন্ত্রণা, এখন মরো, মরে যাও—শুনবো দূর থেকে
কিছুতে যাবো না কাছে, মুক্ত করো হে কাঙাল রাহু
প্রেম, ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে একবার অনন্ত ওঠো হেঁকে :
এখন যাবার বেলা ওর পৃথিবীর অন্যপারে…
কে না জানে ভাবে জল ; ভাসে লাল সাঁতারে স্বাধীন
মুখাপেক্ষী মানুষের একদা কি দুর্দম লড়াই
ভালোবাসাবাসি, শুধু ছুঁয়ে-দেখা, বাস্তব গঠন—
কাকে টানে নম্র কেঁচো, কার মুহুর্মুহু ওড়ে ছাই
বাতাসে সকলি জানি, তবু রাগ কেউটের মতন
এখনো গর্জায় ; ব্যথা ছাপ মারে গোবরের তাল
গলির দেয়াল জুড়ে, কাংস্য ঘুঁটেঅলা আমি ঘোর
তোমাকে বিষাক্ত করি—এমনকি ঘা দিই থাঁড়ার
মড়ার ওপরে, কেন ভালোবেসেছিলাম একদা ?

৯৪

আমার কবিতা থেকে যতগুলি নালা ছিলো তার
অধিকাংশ বুজে গেছে, একটি খোলা, প্রাকৃতিক ত্যাগ
করার জন্যই, আর অন্য আছে নিতান্ত বাঁচাতে
ভঙ্গুর খাঁচাটি, যাতে পাখি নেই, মর্কটে পালক
আকণ্ঠ বোঝাই ; আমি কায়ক্লেশে রেতঃপাত করি।
সন্তানধারণক্ষম নারী আমি পুষেছি সর্বদা
কিন্তু, ডাহা ফক্কিকারি আমার জন্মের বীজধান
না মাটি, না জলে উল্‌সে ওঠে তার আগ্রাসী অঙ্কুর
শূন্যগর্ভ, প'ড়ে থাকে, যেন দিনে বারাঙ্গ-গলির
অর্ধেক স্বভাব তার—গুরু কাজ ঘটে না কপালে!
আমার বিশ্বাস, আমি একা থাকবো—উত্তরাধিকৃত
কিছুতে হবো না ছার কবিতার কিংবা ছা-বালকে!
নিতান্ত তরুণ কবি ছাড়া আমি রসে জব্দ নই
নিষ্ঠুর, উদ্ধত আমি, রঙ্গী ছাড়া সঙ্গী কোথা পাবো ?

শব্দ গুলিসুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসাতে
আমার পেট্‌কাটি চাই, কিংবা কাঁথা মায়াভরা পাড়
সংসারে গেরস্ত-মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে—
এরই নাম ভালোবাসা, এরই নাম চড়ুই-মুখর
কাঁচা কিছু মানুষের বেঁচে থাকা—ইটে খোড়োঘরে ;
সামর্থ্য বাসনা মিশে এ এক মায়াবী ছেলেখেলা !
তোমরা, যারা বড়ো, তারা শ্রুতি বন্ধ ক'রে থাকো দূরে
আমি ভালোবাসবো, জানি গাছে ফুল ফোটানো দুষ্কর
খর জল মূল খায়, জানি সাদা পিঁপড়ের ফুরফুরে
শত্রুতা ; অবশ্য জানি, শব্দ কতো আদর্শ নির্ভর—
শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাসে-কাঁদে, হিসি করে বুকে
খুচরো ক'রে দেয় টাকা এবং যা সোনালি সংবিৎ,
তাকে করে তামা, গায়ে জামা নেই, রুক্ষ নতমুখ—
এ-ভাবে শব্দকে জানি, একদিন তারও মৃত্যু হবে !

ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে
জলের সাঁতারে তেল কিংবা বলা ভালো সে গন্ধের
ভিতরের তীব্র, তাই ব'য়ে গেছে হাওয়ার উদ্দেশে
ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে।
তাকে তো চিনতো না কেউ, আমরাও অস্পষ্টভাবে জানি
তবু তারই জন্য সব অগোছালো গুচ্ছে সাবধানি
মায়ার অঞ্জনকাঠি, কাঁথা ও কল্পনা ক্রমে মেশে—
ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে।
একমুঠি স্পষ্ট মাংস, ঠাণ্ডা-হিম যেমন প্রকৃতি
পাংশু ও নিশ্চেতন, তেমনি সে, মৃত্যুর লাঞ্ছিত
সদাগর কিংবা যেন আমারই মুখের অনুকৃতি !
ভুলে যাবো, ভাড়াটে যেমন ভোলে পরাশ্রয়, পেলে
অবশ্য নতুন, শুধু মাঝে মাঝে অযুক্তি-কল্লোলে
ভেসে উঠবে মাংস, মুখ নিদ্রাতুর, বিষণ্ণ, করুণ !

লণ্ঠনরহস্য থেকে কবিতাকে মুক্তি দেবো ব'লে
এসেছি সদর স্ট্রীট-এ, গাড়িবারান্দার নিচে নীল
সাঁতারু মাছের মধ্যে খেলা করে অবাধ কিশোর
ভিখিরির, তারো নিচে কলকাতার হাঁ-করা পাতাল
শুয়ে আছে, ভাঙা ডিম, হলুদ কুসুমে পরিপ্লুত
যেন আধুনিক কবি বিষাদের, না-কাঁড়া শাঁখের
শুয়ে আছে, বুঝি কোন্ সিন্ধুজলে ধুয়ে-মুছে স্মৃতি,
নিভন্ত লণ্ঠন, ফাটা কাচ পল্‌তে, আমারই কবিতা !
কবিতাকে গ্রাম্য ক্লেদ, পচা পিছুটান থেকে যতো
তুখোড় শহরে আনি, ব্যথা পায়, সব্‌জির মতন—
লুপ্ত হ'তে থাকে আর ক্লোরোফিল বিশুদ্ধ প্রতীকে
অনূদিত হ'তে থাকে : অমন আলেখ্য তার অপ্সরার
কিম্ভূতকিমায় হয় বদখৎ, তারই হাতছানি
পারি না এড়াতে, শুধু কাছে যাই, কাছে যেতে থাকি ।

স্থির ও স্বচ্ছন্দ টান জীবনের দুদিকেই আছে—
দুদিকেই যেতে হয়, বহুদিকে ; কিন্তু প্রধানত
শূন্য ও পাতালে থাকে রেশারেশি, মর্ত্যের মানুষ
ও-দুটি অব্যর্থ দিক ভোগ করে ; নষ্ট হয়, বাঁচে
এবং কপালে পথ বন্ধ হ'লে পা করে পৃথক
আন্দোলন, যেতে চায়—কখনো সাফল্য আমি দেখি
আর দেখি ফিরে-আসা, মূঢ় মুখ ; বিবর্ণ পাঁচিল
ঘিরেছে নতুন বাড়ি অনিবার্য কপালে কেতকী···
এই ভাবে ; জীবনের নিযুক্ত পথের মধ্যে যাবে
একজন ভেঙে দিতে খোড়োঘর, নিঃসঙ্গ বাগান।
অন্য বিচক্ষণ, বলবে : ওকে তুমি হৃদয়ে বসাও
এবং চক্কর দাও মানসিক স্বপ্নের জৌলুসে
ওকে জব্দ করো তুমি, কাছে রাখো, অধিকন্তু কাছে—
স্থির ও স্বচ্ছন্দ টান জীবনের দুদিকেই আছে।

কবিতার সত্যে আমি এক ঝলক মিথ্যের বাতাস
লাগাই, কী পাল্টে যায় কবিতার সত্য একদিনে ?
তাহলে, সত্যের নেই সেই বুঝ্, সেই দাঁড়সাঁতার,
সত্য নয় শিশু, নয় রাজনীতি, নয় মুথা ঘাস !
সত্যই নিষ্ঠুর—এই শুনে আসছি নিরবধিকাল
যেন সত্য, আমাদের পূর্বপুরুষের পাটরানী,
শতাব্দীর একতীরে ব'সে শোনে, অন্যতীরে তাল
পড়ে ভাদ্রমাসে, হায় প্রকৃতি-প্রাক্তন রাজধানি !
সত্যকে হিঁচ্ড়ে, টেনে নিয়ে যাই গঙ্গার বাতাসে
গা জুড়োতে, তারপর ক'ষে মারি দুগালে থাপ্পড়,
পোঁদের কাপড় তুলে ছেঁকা দিই দুপাটা মাংসের
উপরে কলঙ্কের দাগ ! তৎক্ষণাৎ মিথ্যে হয়ে আসে—
বিপুল, অমিততেজা, জাঁহাবাজ সত্যের ভ্রূকুটি···
আমি উঠি, কবিতার হাত থেকে মুক্ত হই, উঠি, উঠে পড়ি।

পরিকল্পনা, এই গ্রন্থ তাকে আপাদমস্তক
ডোবাবে অক্ষরে, জলে—শব্দ হবে সাক্ষাৎ তরণী ;
ভরসার পারাপার দেখাবে যে নিশ্চিত আপন
ভেসে যাওয়া পাল তুলে, ঝংকার, ঝড়ের মুখোমুখি !
পিছনে জানালা এই গ্রন্থ, তাকে আজন্মসম্প্রতি
দেখাবে বিমূঢ়, রূঢ়, লেলিহান জিহ্বা ও জীবনী
বস্তুত কবির—এই ভালোবাসা, ভালোবাসতে যাওয়া
এবং যা কিছু, যাকে শাস্ত্রে বলে : খেদ ও ক্রন্দন ।
আনন্দও কম নেই, পাংশু নিরানন্দ বঙ্গভূমে—
দুঃখ ও গ্রীষ্মকে করে নম্র নীল বাংলার বর্ষণ
তখন, সম্পর্কহীনা, স্বপ্নে ওঠে মন্দিরা বাজিয়ে
যায় কবি, কবিতার মন্দিরে সতর্ক পুষ্প দিতে ;
পার্বণের দিনে এলো সম্ভবত, সহসা বিদায়
জানাতে, সর্বস্ব ছিলো—এইমাত্র স্বর্গে গেলো চলে ॥

অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে

প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬

মঞ্জু ও সুরজিৎ-এর করকমলে

সারাবেলা বৃষ্টিতে বিষণ্ণ হয়ে এলো
কাঁটাঝোপ থেকে ডাক এলো কানে বিদায়-মধুর
নতুন বাসার চেষ্টা এ-বছর এতো আগে—বারান্দায় জল—
শোয়ার ঘরের ছাদ চিড়্ খেয়ে গেছে সেই জলপিপিদের
যাকে আমি ভালোবাসি—যাকে আমি বিদায় নেবার আগে—
দেখে যাবো।

কিছুদিন থাকো ?   আমার বারান্দা আছে—বিষপিঁপড়ে নেই
তালগুড় দিয়ে যায় আমার কৌস্থলি—
খবর-কাগজ আসে—আসে এটা-সেটা
স্বজন-সায়রে মাঝে মাঝে ওঠে ঢেউ
কিছুদিন থাকো তুমি কিছুদিন থাকো
এই তরফের কিছু জেনে গিয়ে ও-তরফে বলো
আমার তা-ও তো লাভ
প্রতি ঘরে ঘরে যেতে ইচ্ছে করে পিওনের মতো প্রতিটি বুকের কাছে।

লোহাগুড়ি গ্রামখানি পড়ে আছে তালের ছায়ায়
যেন বা নেবার নেই কেউ তাকে
সে একাকী তার
এক্রাম মোল্লার ছেলে এদেশ-ওদেশ ঘুরে ছাখে
কে চায় তাদের গ্রাম-ভদ্রাসন-ভিটে
বিবাহ ও বিসর্জন নদীর ভিতর !

অদূরে কোপাই—তার পিঠে বাঁধা বাংলার ফুলের
গন্ধ আমি পাই নাকে
সে কি থাকে ?   সে কি আজো থাকে ?
তাজহাট ছেড়ে ফিরি তাজহাটে ফের

উড়েছে ভ্রমর—শুধু শালফুল ছড়ানো মাটির স্পর্শ বাজে পায়ে
কাঠবিড়ালীর চোখে সড়কের জ্ঞানাঞ্জন নেই
লাল গুঁড়ো ধুলো উড়ে বলে—'আমি সুবিস্তৃত ফাগ
এবার বসন্তে কষে পলাশের সঙ্গে খেলি পাশা'—

উত্তাল মাদার—সোঁদা গন্ধ ওঠে মুচকুন্দ ফুলে
পাপড়ি ঝরে পড়ে থাকে, সাপের গর্তের খুব কাছে
ছোটো সাপ খেলা করে
জানি না, পোকার মতো কেউ ভূমণ্ডল মুখে করে চলে যায়
বোধি-নিরুদ্দেশে
তোমার কোথায় দেশ ? কিবা পরমাত্ম-পরিচয় ?
তুমি ছোটো ঘরে বসে আজীবন পড়াশুনা করো
তোমার সামান্য আয়, তুমি স্ফীতোদর।

জলপিপিদের কান্না ফেটেছে তুফানে
ফাল্গুনের শেষ
কাশে আগুন দিয়েছে কোনো লোক
তারার চিতার মতো সে সবই অসংখ্য আছে পড়ে
জলের ভিতরে ঝাঁঝি—চারপাশে স্ফটিকের মতো
জল—তার পূর্বঘাটে দাঁতের মাড়িও পড়ে আছে
মানুষের গান বাজে চিমনির ধোঁয়ায়
ধানকল-পায়রা উড়ে চলে যায় খোলাক্ষেত ছেড়ে
গৃহস্থ যেখানে কম—সেখানে তবুও মেলে গৃহ!

তাড়িখানা থেকে আসে রিক্‌শা সারি সারি
তোমার বক্তৃতা শেষ—তবুও দিলো না ওরা গাড়ি
তুমি ফেরো হেঁটে
গোয়াল-গরুর মতো আপাদমস্তক মেশা কেঁটে।

কাছে থেকে দূরে যায় উত্তরবাতাস এই দেশে
এই দেশে অপরূপ কৌটাবাদামের চাষ হয়
তার ফুল মুখে-ধরা গাছের ঝিনুক দেখে আমি
সমুদ্রের কথা ভাবি—পলিথিন্ সমুদ্র কি নেই ?
কেউ কেউ টের পায় সেই সব সমুদ্র—সাল্‌মন
বাতাসেও ধরা পড়ে—বাতাসেরও অশ্বশক্তি আছে।

দেখি নিচে অথৈ খোয়াই
পুরানো ঘৃতের মতো রোদ্দুর মিশেছে নালি-ঘাসে
ইতস্তত শর, ঘাস-খই
অ্যামিবা-উইড্ কতো পড়ে আছে পাশে
মরুম, পাহাড়-ভাঙা পথে তবু দাগ দেখা যায়
গরুর গাড়িটি কার বসে আছে বিষণ্ণ বাতাসে ?

আমাদেরও স্পষ্ট করে জানা দরকার
এ-দেশে এসেছো তুমি আগে নাকি ?
ঐ তালবীথিখানি স্পর্শ করে ভুলে গেছো নাকি ?
আকাশমণির চারা, দেখে গেছো সেগুন-মঞ্জরী
আমাদেরও স্পষ্ট করে জানা দরকার
এদেশে এসেছো তুমি আগে নাকি ?
আমাদেরও আগে ?

অজয়ে প্রক্ষিপ্ত ব্রীজ—তার দুই তীরে আছে পথ
মাঝে মাঝে জাল ফেলে কেন্দ্রে বসে গেছে আদি জেলে
মাকড়সার মতো—
আধেক শহরে-ঠাসা কটি নার্স এখানে উজ্জ্বল

রোদ্দুর পোহাতে আসে
তাদের পছন্দ এ-অজয়
কিংবা শুধু তাইই নয়, অজয় পুরুষ-নাম বলে !

মাঝে মাঝে আমাদের অবস্থা-বন্দিত্বে আসে রোদ
পসরাও নিয়ে আসে বিলাসপুরীর ক্ষিপ্র মেয়ে
অ্যালুমিনিয়ম আনে, বদলে ব্রোকেড নিয়ে যায়
রঙের দুলালী সে যে, সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলা করে
আমরাও খেলা করি—আমাদের খেলা থাকে রোজ
রেফারির ছুটি সেই খেলাকে বিপন্মুক্ত করে—

বল্লভপুরের ঘাট—সেই ঘাটে এসেছে কোপাই
কাঁধে ভেঙে চুল
বর্ষায় ভেসেছে তার কূল
তখনি সর্বস্ব কাছে পাই ।

'কাছে দূরে অবিরাম গ্রামপতনের শব্দ হয় !'
স্থরুলের শেষে পাবো খেয়াখাট—জ্যোৎস্নায় লৌকিক
বাঁশবন ভেসে যায়—ইন্দ্রিয়ে লেগেছে এসে ছাই
'মন তুই ভালো করে পড়গা ইস্কুলে—'

রাঙ্ চিতাবেড়ার ভিতরে সেই মহাপ্রভুতলা
অনন্ত খঞ্জনী বাজে—দীর্ঘ গ্রাম যায় বেঁকেচুরে
উদ্দাম ধুলোট্—পাখি বলে শুধু 'নিতাই নিতাই'
কঙ্কালীতলার মাঠে আমরা ভিন্ন নীতিশিক্ষা পাই ।

এবার রোদ্দুরে
দীর্ঘ পথ হেঁটে, যাবো ঘুরে—ভেদিয়ায়
পুরানো পাণ্ডুর ঢিবি দেখে যেতে মন মোর চায়
এবার, বৃষ্টির আগে
প্রচ্ছন্ন ঈশাণে—মেঘ জাগে
নিরঙ্কুশ, যাবার সময়
পৃথিবী-ব্যাপক শুধু খেলা করে ক্ষয়।

বাদুড় উড়েছে রাতে—ভাঙাবাড়ি, গন্ধগোকুলের
পদশব্দ টের পাই—পায়রাছানা উঠেছে ককিয়ে—
দুয়ার খোলে না কেউ, খসে পড়ে প্লাস্টার-খিলান
সেখানে ছিলে কি তুমি কোনোদিন ? বিপুল করাতে
কেটেছো কাঠের ঘোড়া ?

প্রতিটি মহল আমি ঘুরে দেখি—প্রতিটি পাথর
নখ দিয়ে তুলে দেখি—সিঁড়ি বেয়ে উঠি আর নামি
একতলায়, মনে হয়, আছো তুমি—তৎক্ষণাৎ নিচে
দৌড়ে গিয়ে ভাবি তুমি উপরে উঠেছো ঘুর-পথে
পথ তো অনেক আছে—লুকোচুরি খেলার সময়
সেই পথ বেড়ে গিয়ে অজস্র-সহস্র হতে পারে।

ইটিণ্ডাঘাটের দিকে গেছো নাকি ? বেনাচিতি ঘুরে
দুর্গাপুর স্টীলপ্ল্যান্ট্ ? যেন তুমি ব্যর্থ কারিগর
সফল সংস্রব নিতে ঘুরে মরো কলে-কারখানায়
কোথায় নিয়োগপত্র ?
নিযুক্ত করো না তুমি যতো

নিজেরো নিয়োগ ছেঁড়ে বঁড়শির বিশাল কাত্‌লা, জলে—
মাছরাঙাগুলো হাসে, বলে শুধু 'সে কই সে কই' ?

রংটার বাগানে আমি গেছি একা—তুমি তাও জানো
তোমার ইস্কুল ছিলো, হাইবেঞ্চ ডেকেছে তোমাকে
তুমি পাহাড়ের পথ ছেড়ে ধরেছিলে করিডোর
একে-ওকে শুধিয়েছো—'যাবে নাকি ?'
একা কি বিশাল অর্জুনগাছের কাছে যাওয়া যাবে ?

বাংলাদেশ ছেড়ে আমি গিয়েছি নক্ষত্রে বারবার
মাটির আলাদা রঙ, বাতাসের স্পর্শও পৃথক
কাছে-দূরে—শুকনো পাতার সিঁড়ি ওড়ে ঘূর্ণিঝড়ে
হয়েছে চৈত্রের শুরু—পলাশের শাখার ক্রন্দন
পাহাড়ে নিস্পন্দ মালা দেখা যায় রাঁচী রোড থেকে
অত্যন্ত চড়াই—বুকে হেঁটে আমি পৌছাবো মন্দির
হারিকেন জেলে তুমি বসেছো উঠোনে—
সজিনার পাতা ঝরে—তবু কার বিদায়বেদনা
এতো সুখকর—তুমি চোখ বুজে রাতের লাটিম
ঘোরাও চত্বর জুড়ে—তুমি ভীরু, তুমি বাল্যমনা !

চিন্তার ভিতরে কালো কাক করে কাহিনী-বিস্তার
উজ্জ্বল রোদ্দুর—কাছে দূরে শুধু বাতাসের জল
পেয়ারা গাছের নিচে শুয়ে আছি—বিবাহই সব
শোলার টোপর চাই, পরিষদ, হ্যাজাক লণ্ঠন
তোমাকে চাই না আমি এই দেশে—তিস্তার এপারে
এখানে বসতি সবই ক্ষণস্থায়ী, শুষ্কতা-নির্ভর।

সেবার জ্যোৎস্নায় বাঁধ বাঁধা হলো খুব
বিলাস-ব্যসন হলো—বিজলির ডুম্ বেঁধে দেওয়া হলো গাছের অন্তরে
বলা হলো—'নিজেদের ছাখো'
বহুদিন এই দেশে তেমন যথার্থ আলো নেই
টর্চবাতি নেই—নেই আত্মসমীক্ষণ—কনেদেখা—
সৌন্দর্যতৎপর বাঘ লাফ দেয় হরিণের পানে
হরিণ, মৃত্যুর ভাষ্য তৃণের সবুজে দেখেছিলো।

সবুজ কাচের কাছে তুমি যাও—তুমি সাঙ্গীতিক
বিকালের দিকে এই বাঁধে এসে বসো একধারে
পিছনেই পিল্‌খানা—অন্যমনে করো তুমি ঠিক
বাঁধ বাঁধা হতো ভালো অনেকেরই প্লাবিত অন্তরে !

পাত্‌কাটা হাট ঘুরে দেখে আসি—কোচপুরুষের
মনিহারী বেচাকেনা
নারীর নিকটে থেকে দূরে এইসব পুরুষেরা
অথচ সংসার পড়ে আছে যেন পেঁপের হৃদয়—নিরক্ষর
ইন্দ্রিয়প্রধান এদেশ লেগেছে ভালো
ধুলোয়-গরুতে মাখামাখি
সড়ক নে—তবু পথ ছুঁয়েছে গ্রামের
পুঁই-মাচানের পাশে অনন্ত ইঁদারা—দিব্য জল।

আমাদের তৃষ্ণা আছে—পানীয় খুঁজেছি দেশে দেশে
গ্রাম থেকে গ্রাম গেছি—হৃদয়ে হৃদয়ে ঘুরে ফিরে
অনেক দেখেছি আমি চোখ ভরে—নিছক ফিসফাস
অনেক শুনেছি আমি কূটতর্ক-কৌতুক-সন্দেহ, এসবও যথেষ্ট ছিলো

জীবনের ভাড়াবাড়ি অদ্ভুত আঁধারে ছিলো ঠাসা
এভাবেই থাকা ভালো—দুয়ারে উজ্জ্বল নেমপ্লেট
পদবীও জানা থাকে—কার্যব্যপদেশ, বাল্যকাল
কোথায় কেটেছে তার—মানুষের কাছে জানাবার
ভরসা থাকাই ভালো, আঁধারেরও সমান মর্যাদা
এই দেশে।

তোমার কথাই ভাবি—জঙ্গলে বাংলার কত দাম
অ্যারিস্টোক্র্যাটের কাছে—
স্যানিটারি সংসার তাদের!
তোমার কথাই ভাবি—এই হাটে
শুয়োরের মাংস শস্তা, শুকনো মাছ—দীর্ঘ কড়া মদ
সুপারি-গরাদে-ঘেরা এ-অঞ্চলে উড়েছে মোরগ
বিস্তর লড়াই, জুয়া, চঞ্চল জীবনে স্বার্থবোধ
এখানে পাবে না তুমি
এখানে সপ্তাহ ঘুরে যায় ভয়ঙ্কর চা-বাগানে
ডুয়ার্স ডুয়ার্স বনভূমি!

নিজের কাছেই তুমি বসে থাকো, নতুন ল্যাণ্টার্ন
জ্বালিয়ে চিরটাকাল দিনরাত আঁধারে ও রোদে
কে বলবে তোমায়—'নেই আঁধার—সর্বোচ্চ থরতাপ'
তোমার অন্যান্য বোধ সবই স্বার্থবোধে মিশে গেছে
প্যারাসাইটের মতো একাগ্র কি জীবনবাসনা?

তুমিই নক্ষত্রবীথি—তাই শুদ্ধ তৃষ্ণার আঁধার
তোমাকে না দেখা ভালো
তুরপুন হাতে, ভাবো তুমি,

কাছেই ইঁদারা খুঁড়বে—তুলবে জল অনন্তস্রোতসা।
আমার চাঞ্চল্য বেশি, নই বটে বদ্ধপরিকর
তোমার মতন, তাই ভেসে চলি এখানে-ওখানে
মানুষের মুখ দেখে অতীতের তৃষ্ণা ভুলে যাই
তুমি ভারি স্থাণু, তাই কিয়দংশে বিপদসঙ্কুল !

এখানে পেতেছি ফাঁদ—সবুজ ঘাসের পায়ে জল
ভেঙে পড়ে—সতর্ক থাবায় খসে ভাল্লুকের মাটি
মহুয়াগাছের তলে—গোল হয়ে নাচ নেচেছে সিপাহী যারা
বনের পাহারাদার—ফরেস্টার
এখানে পেতেছি ফাঁদ—অন্তরে মাকড়সা-তন্তুজাল
এখানে পেতেছে ফাঁদ অনেকেই
অনেকেই কাকে ধরে নিয়ে যেতে চায় কুয়াশায়
শহরে ও গ্রামে—অনেকেই পাতে ফাঁদ
নিজে পড়ে ফাঁদের ভিতর—সব শেষে।

একে প্রতীক্ষাও বলে—একে বলে প্রভাববিস্তার—
মানুষ প্রকৃতি থেকে এভাবেই ছেঁকে নিতে চায়
শান্তি সারাৎসার কোষ্ঠ অনন্তের জীবনবেলার
শেষে দারুভূত হতে হয়
আছে কি খেলার মাঠ, নদীতীর সার্কাস সেখানে ?
নির্বাচন আছে নাকি ? গোলপোস্ট ? দরজির দোকান ?

মানুষের বেঁচে থাকা—মানুষের শান্তি পাওয়া শুধু—মনে হয়
মারা গেলে ? শান্তি নেই—ক্ষুধাতৃষ্ণাযৌনের অতীত হতে পারে—
হয় নাকি ? ভূতের সংযোগ তবে নেই প্রেতিনী নিমার সাথে ?

নেই নাকি বিবাহবিচ্ছেদ সেইদেশে ?—মানুষেরা জানে।
মানুষের বেঁচে থাকা—মানুষের শান্তি পাওয়া শুধু—মনে হয়
গণ-আন্দোলন করে বাঁচা নাকি সম্ভব বিদেশে !

হয়তো মানুষ নয় ওরা কেউ—আকাঙ্ক্ষার হাঁস, সরোবরে
চলচ্ছক্তিময়—ইন্দ্রিয়গোচর মাছ, খুঁটে খায় পোকা ও ঝিনুক—
এইসব খেয়ে ভাবে—পদ্মের কোরক খেলে হতো—
তখন বাসনা ভরে টইটুম্বর—ঠাঁই নেই আর—
গণ-আন্দোলন করে সেখানে তবু কি ঠাঁই হতো ?
বাঘেদের পাওয়া যেতো হরিণের রাশির ভিতরে ?

দুইটি মানুষ দুই পৃথক রাজত্বে করে বাস
একের সংস্পর্শ আর চায়নাকো—সবাই পৃথক
মেয়েমানুষেরা বলে—তারাও পৃথক হতে পারে—পৃথিবীতে তাও হয়
নাকি তাই ভবিষ্যতে হবে !

সমুদ্রের কাছে এসে দাঁড়াবার পাবো না সময় এখন সমস্ত রাত
এখন সমস্ত রাত মরুভূমি থেকে বালি এসেছে এখানে—
অনন্ত চাদর হয়ে উড়ে তারা এসেছিলো ভেসে—
আমরা সমুদ্রতীরে যাবো বলে—শুনে এই কথা—

ওদের সমুদ্র ছিলো—ওরা তাকে পেতে চেয়েছিলো, আমাদেরই মতো
সুতরাং পায় নাই—পেতে চাওয়া, পাওয়া এক নয়
বরং ফিরিয়ে দিয়ে সাপুড়েও পেতে পারে সাপ
আমরা সমুদ্র কাছে পেতে পারি বহুদূরে বসে
পাহাড়ের চিন্তা দিয়ে ঢাকা থেকে—পাথরের চিন্তা দিয়ে ঢাকা থেকে।

ভবিষ্যতে হবে অতীতের সঙ্গে দেখা একদিন—বহু বহুদিন
তখন স্টেশন ছেড়ে গাড়ি আরো দূরে চলে গেছে—
নাকি মোটে আসে নাই—এ-সংশয় হবে সমার্থক ?
জানি না, কি লাভ জেনে—অগোচরে এনে গোচরের গোপন সম্পদ ?
কিংবা আত্মগ্রাসী বলে গাল পেড়ে দেখানো সংসদে ?
বর্তমানে বেঁচে আছি—বাঁচার অধিক আছি মিশে তোমাদের সঙ্গে কাঠ
ভোরবেলা, তোমার সঙ্গেও, মানুষের সঙ্গে নয়, মানুষীর সঙ্গে
নয় কোনো।

যাবে নাকি ? ওদেশে এখন

কাঠবিড়ালীর পাশে শুয়ে আছে মন
ভাঁজ হয়ে ধুলোর উপরে
কেউ নেই ওদেশের ঘরে—
তালাচাবি
'ওদেশ ফেলেও যেতে পাবি'।

কমলালেবুর বনে এসে গেছি—দূরে খাসমহল
অতীতের ভাঙাগাড়ি পড়ে আছে বনের ভিতরে
পথ স্বপ্ন—নুড়ি ও পাথর
আত্মজীবনের বাঁধা ঘর
শুধু আছে
নিঃসঙ্গ জঙ্গল এলো কাছে
সন্ধ্যাবেলা, পাতার ফিসফাস
মনে হয়—সরোবরে হাঁস
ছিলো ভালো।

কমলালেবুর বনে এসে গেছি—দূরে খাসমহল
নিচে মূর্তি নদী খোলে জল

সারবন্দী নীলগাই ভেসে চলে মর্যাদা বাড়াতে
এই বনে—বনের পাড়াতে
হঠাৎ এসেছি আমি? নাকি চিরকাল করি বাস
নূতনে স্বাগত করে—নাকি পাতা, মনেরই সন্ত্রাস?
কমলালেবুর কাছে বসে আছি—নাকি লেবু বসে আছে পাশে
জানি না, জেনেছে কেউ পৃথিবীতে মানুষের ঘাসে
নক্ষত্রের প্রয়োজন আছে কিনা?
সে-সবও জানি না।

কুঠার পড়ার শব্দ কোলাহল হয়ে বাজে কানে
মূর্তির ঝর্ণায় আছে গান
লেবুবনে ভ্রমরই শাম্পান
দুই তীর টানে।

ছেড়ে যেতে হবে আজই এই দেশ কেননা, গরাদ
এখানে ক্রমশ ওঠে—দেখা দেয়—মূর্তির ওপারে
পাহাড়চূড়ার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন কেউ
আমাদের লোক নয়—নিছক সম্পর্কশূন্য নয়—
কাজ আছে।

সামসিং পাহাড়ে এসে বোধ হলো শ্বাপদ-সঙ্কুল অনেক আমার মন
তোমাদেরও আছে—পাখি থাকা ভালো ছিলো—
অবিমিশ্র ভালো কোথা পাবে? রাজবন্দী চোরও হয়—
ধূসর প্রাধান্য পেতে পারে হেমন্তের কবি যারা, তার কাছে
বালিকা কি নয় লালরঙে মশগুল?

চুল তার উঠে আসে খরস্রোতা কালের মুঠিতে
কখনো পায় কি টের ?   টের পেলে খতিয়ে ছাখে না
তাকে যারা জন্ম দেয়, তাকে যারা বলে দেয়—'হাঁটো
মানুষের মতো পায়ে—ইস্কুলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
থেকো না সমস্তক্ষণ—বুঝে এসো—অঙ্কে করো পাশ !'

কোদালে মেঘের মতো ভেসে চলি—দূর থেকে কাছে
ক্রন্দসী উইলোয় তার সাড়া পাই—কেন অকারণ
এই ডাক ?   এই হাতছানি ?
নিকটে গেলেই যদি উড়ে যাবে।

'মৃত্যুর স্বতন্ত্র দেশ !'   ক্যানারি পাখিরা বলে যায়, বনে বনে,
গাড়ি-বারান্দায়
আমি সে-কথার সুদ ভোগ করি—তোমরাও করো
ক্যানারি পাখির আছে প্রাণ-স্বাদ—আছে বনভূমি
আমাদের আছে বাসা, পথে জল, সিউড়ির হোটেল
হৃদয়ে-মস্তিষ্কে আছে দরাদরি—কে করে সংযোগ ?
দড়িতে আল্‌নায় যেন জামা ঝুলে আছে—
'মৃত্যুর এই তো দেশ !'

কাএ অপণা ন তুটই মালা বি অহারেই
জাল অকাল বেনি বি লেই ॥
জাল ন সিকল রে হরিণা এক বি বাসই
চঞ্চল চঞ্চল চলি রে স্থণ মাঝেঁ সমাই ॥

নিচের পৃথিবী থেকে উপরের পৃথিবীতে চলে যেতে হবে
বিদায় নেবে না তুমি
বিদায়-মুহূর্তে ওড়ে অসংখ্য রুমাল
নিকটের শাখা থেকে দূরে বুঝি যাবে কিশলয়ে
তোমার রটনা—তুমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী
তা কি কিশলয় ?

জন্মমুহূর্তের পরে আর কেন দেখি না, তোমাকে
নিষিদ্ধ ফল কি তুমি খেয়েছিলে
তুমি গাছতলা শুধু ভালোবাসো
শানের পুকুর তোমার লাগে না ভালো—নিরুপায়
আমায় উত্ত্যক্ত দেখে তবু বলে গেছো :
'সবার থাকে না বীজ, শাখা থাকে'

আমার অতীত আমি জেনে গেছি—আমি ভাগ্যবান
হাঙ্গেরীর সোমা জেনেছিলো তাই ঘুরেছে তিব্বতে
বাবার দলিল যেন হাতে পেয়ে গিয়েছে হঠাৎ
লাসার পথের স্বপ্নে গাঁথা তার নিশ্ছিদ্র সমাধি
সেখানে কিছু কি জমি পাবো আমি !

তুমি বেদনার হালখাতা করো টেরেটিবাজারে
সেখানে অতীব সস্তা প্রণ-চাউ
ঐসব দিয়ে তুমি ভোলাও পথিকে নিজে, মহাজনে আর
পরম্পরাবোধ নিয়ে কাব্য রচো নির্ঘাত এলেজি
একাডেমি ফুটো করে এলে পাবে বিবাহ ও বাড়ি।
তোমায় দেবো কি তবে কলরব ?

এখানে ফুটেছে কতো ক্যামেলিয়া—নানান রঙের
মেয়েদের মতো
উইলোর ডানা থেকে ঝরে পড়ে সন্ধ্যার ভূতের
দারুণ রুপালি চুল—তুমি কি তা চাও?
রোদ্দুর লেগেছে বলে আমাদের বিবাহের মানে
ওলোটপালোট হয়ে গেছে আজ—আমি সবই জানি
গন্ধে মাছি বসে গেছে আমার আত্মায়
হাটুরের মতো।

শূন্য থেকে উড়ে যাবে পূর্ণতার পানে
এ কোন্ দুরাশা
আমাকে ঘিরেছে আজ—বলে ভাঙো বাসা
চলো উড়ে—
এখনো রয়েছে চিন্তা অনর্থ নূপুরে!'
সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বসেছি পাথরে
বলে—'মদ দাও',
শুধায় সন্ন্যাসী—'তুমি এ-ছাড়া যা চাও
পাবে মোর কাছে—
স্বর্গও বিস্তৃতভাবে আছে।'
বলি—'দাও তাকে'
সন্ন্যাসী প্রসন্নমনে ডাকে—
'রমলা—রমলা—'

এদেশে নাবিক নামে তানপুরা হাতে
বৈচিত্র্য এখানে বেশি

মেঘের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় তুলাফুল ছার
এখানে নিষ্ঠুর শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘার
ঘাই-হরিণীর দল
তাছাড়া সমস্ত কিছু আপাত-সরল।

বড়ো বেশি রাজকার্য করেছি একদা
এদেশে—এখন
রাজারই সমাধি চোখে পড়ে অগণন
সে-সবের ভিড়ে
নিজের সমাধি ভেবে যার কাছে ফিরে
সহাস্যে দাঁড়াই
সে বলে—'কফিন খালি নাই!'
মনে হয়, সে ছিলো বাহিরে
আমি তাকে পাইনের ভিড়ে
দেখি নি যথেষ্ট সূক্ষ্মভাবে
—এভাবে কি দীর্ঘকাল যাবে?

পুরাতন বইগুলি রেখেছো কি ঘরে
আজো কি আমাকে মনে পড়ে
নির্দ্বিধায়?
হেমন্ত-সন্ধ্যায়
গাছের শিথিল পাতা ওড়ে ঘূর্ণিঝড়ে
আজো কি আমাকে মনে পড়ে?
তোমার সমস্ত গান ভোরবেলাকার রেলওয়ে-বিলে মাছরাঙা
তোমার সমস্ত ছবি পাগল-ঝোরার

এখনো শীতের রাতে বিছানা-পাতার শব্দ হয়
মশারির কোণগুলি খসে পড়ে ভারি হাত লেগে
তোমার কাঁধের 'পরে জিরাফের মুখ
কোন্ বন থেকে এলে প্রিয়তমা স্পর্শ-লালায়িত ?
বীরভূম—বীরভূম—জোড়া বাউল-বৈরাগ
তুচ্ছ সে, খঞ্জনী বাজে তোমার কঙ্কালে।

ছুরি কি ধারালো খুব অক্ষরের মতো ?
তোমার চিঠির ব্যথা দিয়েছি প্রত্যেকে
ওরা তো সকলে রুষ্ট
বলে—'ছিঁড়ে খাবো।'

তুমি ভয় পেলে নাকি ? এ তো বাংলাদেশ—
নারী মাত্রে বরণীয়া

'কে খাবে তোমাকে ?'
তাছাড়া সভ্যতা আছে মঠ-সদাচার
বি এ পাস করে ওরা মাস্টারি করেছে
বড়জোর রক্ত খায় ছাত্রের বাবার
তোমাকে কিভাবে খাবে ? তুমি পাচ্য নও।

অদূরে সকাল থেকে মেঘ ডাকে ভুটান-বর্ডারে
এরা কি বিষণ্ণ লাল-হলুদে মেশানো
এদেরও বিলাস ফার্ন-অর্কিড-কসমসে
তোমার বিলাস ! যেন বালকের মতো
সিংহকে বাদাম দেওয়া—
আজো আছে তাই ?
তুমি মুক্ত, এ কারণে, সিংহ ছাড়া নাই।

প্রতিযোগিতার পথে গিয়েছি দৈবাৎ
অথচ আমাকে টানে সে যে কার মতো
বুঝি না এখনো।
কেউ হাত রেখে দিলে আমি রাখি হাত
যেন বা দ্বৈরথ
প্রতিযোগিতায় কাটে নিত্য সারাদিন।

জনসভা থেকে আমি এসেছি কি নীরব পুতুলে
মোনাস্টেরি জ্বালে তার জাজ্বল্য বাসনা
ওম্ মণিপদ্মে হুম্—কালের হুইল
নিদ্রার ভিতর নাড়ে বুদ্ধ-বিলাসিনী
তুমি এসে দেখে যেয়ো বৃদ্ধার বিশ্বাস
তবেই সামর্থ্য পাবে।

মুখের কুঞ্চন মাংসে ধরে গেছে উই
তবু পদ্ম তার প্রিয় কালান্তের তরী—
সে কথা তুমি কি জানো?   কাঠের নৌকায়
ভেসে চলো অবিরাম ইডেন-উদ্যানে
তোমার যৌবন, আহা, বসন্তের টীকা
কর্পোরেশনে।

পেয়েছি নিজের করে একখানি বাড়ি—কাচের কাঠের
জীবনে পেয়েছি আমি ঢের
সে সব ছাড়াতে
কতোবার যেতে হবে তোমার পাড়াতে?
চিঠিতে তোমার

ঠিকানা দাওনি, তাই বুঝে উঠা ভার
রয়েছো কোথায়—
এখানে আকাশে মেঘ শীতের সন্ধ্যায়।

বর্ধমানে গিয়ে করো গণ-আন্দোলন
তোমারও মুনাফা চাই
কবে কোনদিন যাবে পলিটব্যুরোতে
সে-কথা বসন্তরাতে করেছে পীড়িত
পাখিদের গান তা কি লাগে ভালে কানে
উৎসব-শেষের রাতে অঝোর সানাই
কিংবা সবই তুচ্ছ—সবই কল্পনার ডানা
নানাভাবে রঙ-করা বিদ্রোহ ভোলাতে!

কাদাখোঁচা পাখি আমি দেখেছি কতোই
আপাত-বিশুষ্ক জলে
দূরে কাঁপে বই
তোমার হাতের ফাঁকে প্রেমে-কৌতূহলে
সে হবে অঘ্রান মাস—ব্রীজ বাঁধা শেষ
তোমার প্রথম ডাক—'শোনো অনিমেষ'
কী কথা শোনার ছিলো—নিস্তব্ধ আকাশে
তোমার কবোষ্ণ স্পর্শ তবু মনে আসে।

সেদিন মধ্যাহ্নে হাওয়া হঠাৎ চঞ্চল হলো বনে
পেঁপের হলুদ পাতা বারান্দায় খেলার ভিতর
তোমাকে এনেছে কাছে
কার পদশব্দ অহরহ
বনের বেদনারাশি নিয়ে আসে সুপ্ত জানালায়?

তোমার রক্তিম মুখ সেদিনেই করেছিনু পান
যৌবন-সংহতি মেখে তুমি হলে হেমন্তের রানী
পাতা-ঢাকা, লক্ষ্যভ্রষ্ট—কিংবা গৃহ কম্পনে ভেঙেছে !

ফ্ল্যাগপোস্ট দেখা যায়—কাছে টার্মিনাস
বাসনার বল আমি গড়িয়ে দিয়েছি
সে যাবে অনেক দূর
গোলপোস্ট হাতে নিয়ে ছুটেছি পিছনে তার পাগলের মতো
আমার একারই খেলা শীত-গ্রীষ্মে, দিনে ও নিশীথে।

কালও তুমি এসেছিলে—রাতে বাদুড়ের
চাঞ্চল্যে পেয়েছি টের আমি সেই কথা
বাদুড় কিভাবে জানে নারীদের ক্ষুধা—প্রেম নয়—
মাঝরাতে ফিরে এলে পর-পর সত্য বহুদিন
এমনি পেয়েছি আমি—
প্রেম যেন দেহে এসে না ঠেকে আমার এমন সংজ্ঞাই ছিলো।

এবার চৈত্রের শেষ—বৈশাখের শুরু
মাঝে মাঝে কষ্ট পাই তৃষ্ণার-ক্ষুধার
কিন্তু কোন্‌দিকে পাবো রহস্যের পণ্যভরা নদী
তোমার হিসাব তুমি বুঝে নিয়ে ফিরে চলে গেছো
ফেরিঅলা হেঁকে যায়—'পাথর—পাথর'

লালবাগ থেকে আমি সূর্যমুখী এনেছি অনেক
দেয়ালের পাশে পুঁতে অনেক ঢেলেছি আমি জল

ইশারায় কাছে এসে ফের চলে গেছি
অদূরভাষিণী তুমি, কথা বলো ফুলে
আমি ঘরে ছেড়ে শুধু দেখেছি বাগান।

নির্দেশ ছাড়াই ঘণ্টা বেজেছে ফটকে
সেও স্বাধীনতা-প্রিয়
তোমাকে দেবো না দোষ আমি তবে আর
তুমি যথা-তথা যাও—যেখানে-সেখানে
আমারও দরজা খোলা।

দোলপূর্ণিমায় তুমি গিয়েছো কখনো—জৈনমন্দিরের কাছে
ওখানে নদীটি শুয়ে আছে
পরস্পর
যে-কথা বলেছি আগে তারই ফলে ভেঙে গেছে ঘর
এখন জানালা তার ভেসে যায় জলে
আমাকে গোপন কথা বলে
তীরের জোনাকি
'এখানে আসে নি কেহ, আমি একা থাকি!'

তুমিও বেসেছো ভালো আপন তিমির
দুঃসময়ে নৌকা বাঁধো অজয়ের কূলে
ইলামবাজার যাবে—বৃষ্টি নামে ঘোর
তোমার চাঞ্চল্য ঢেকে বলেছো : 'বাজারে
বিদেশের ছাতা মেলে—আমি দেশি চাই।'

ফুরালো পৌষের মেলা বছরের মতো
এবার হাউই নেই—পার্থক্য অনেক
তুমি এসেছিলে নাকি কারো ছদ্মবেশে?

ওরা চেয়ে দেখেছিলো একাকী ভ্রমণে আমি কতো কষ্ট পাই
আমি রাজহাঁস ভাসিয়ে দিয়েছি কতো কোপাই-এর জলে
অন্ধকারে দেখা গেলে গোয়ালপাড়ার বাতায় লণ্ঠন
তুমি হেসে বলেছিলে : 'ওরা কতো সুখী!'

যেন-বা শতাব্দী পরে দেখেছি তোমার
ফটোগ্রাফ—পোর্টম্যাণ্টো খুলে
অশরীরী ছায়া বুঝি সরে গেলো ঝুল-বারান্দায়
অথবা চোখের ভুল—বয়স হয়েছে
কপালের তটপ্রান্তে ফুটেছে রূপার মতো প্রাচীন কেশর—
তুমি অকস্মাৎ কেন চমকে উঠেছিলে
পালিত-প্রতীক সেকি? নাকি তা ইস্কুল—
ব্ল্যাকবোর্ড-তলে মাথা জর্জর খড়িতে?
তুমি জানো।

সাধারণ্যে ঝরে পড়ে বিজ্ঞপ্তি-বাজেট
তুমি কি তা দিয়েছিলে? নতুবা কিভাবে
আমার কানেও গেছে বার্ধক্যের কথা।
সামান্য বছর দশ বাদে যদি অবসর পাও
সহস্র টাকাতে তুমি বাড়ি নেবে শিমুলতলায়
সামনে-পিছনে মাঠ পাবে, তাতে গোলাপ বসাও
কিচেনগার্ডেন করো—টেরিয়ার পোষো যদি দুটি
অখণ্ড আনন্দ পাবে।

মাঝে মাঝে ডেকেছে শেয়াল
দুঃখসুখ—এসব খেয়াল
প্রাণের পাড়াতে
চাঁদেরে পাহারা দেয় সান্ত্রী লাঠি হাতে
তোমার কি ভয় ?
রুপালি কেশের সঙ্গে ওতপ্রোত কাঁসার হৃদয় !

তুমি ছোটো ছেলে নিয়ে দেখিয়েছো খেলা কতো বারান্দার কোণে
তোমার বাড়িতে তুমি নিমন্ত্রণ করেছো অনেক
সে তোমার জন্মদিন
অতিথি-সেবার ত্রুটি তুমি কোনো রাখো নি প্রকৃত
সকলেই চর্ব্যচুষ্য খেয়ে চলে গেছে

আসায় হয়েছে দেরি, ফলে তুমি করেছো ফাইন—
'সকলের শেষে প্রভু আপনাকে—নিঃসঙ্গ ছাড়া হবে।'
সকলেই চলে গেল, উৎসবের শেষ—
সহসা তোমার গান শুরু মধ্যরাতে
'বাড়ি কি যাবো না আমি ? সকলের থেকে
আমি কি পৃথক।'

তোমার সংগীত যেন পলাশের ফুল
তোমার সংগীত, তাও লণ্ঠনের মতো তৃষ্ণায় আতুর
পরাধীনতার অর্থ শুনেছো কখনো ?

জানালার পাশে এসে বসেছি দুজনে
যেন পথে আলো দেওয়া কর্তব্য তোমার—বসন্তের রাতে

আমাকে এনেছো, তা কি নিষ্প্রদীপ বলে
জাগাতে উল্লোল ?
তুমি সব পারো—আমি আলোরই অধীন
অথচ রয়েছি পড়ে স্বতন্ত্র আঁধারে—
এসব তুমি বা কেন দেখেছিলে ?

কর্ণফুলী নদী তুমি দেখেছো শ্রাবণে—
নিষ্ঠুর, সহস্র—সে কি দৈত্যের উল্লাস ?
নৌকা যতো বড়ো হোক, তারও চেয়ে ত্রাসে
তাকে সঙ্কুচিত করা আরোহীর মনে—
কর্ণফুল নদী তুমি দেখেছো শ্রাবণে ?

তাল-সুপারির দেশে তুমি গেছো নাকি ?   নিনেভ-সান্দ্রিয়া ?
একা সব পথ তুমি ঘুরেছো নির্জন ?
তুমি ভালোবাসো তাই
আমি দীর্ঘ দিন ঘুরে লোকের সমাজে
নিজেকে করেছি সঙ্গ-বান্ধব-বিহীন—
এরই নাম বিষণ্ণতা।

ছেলেবেলাকার কথা মনে হয় রোজ
কি তুচ্ছ জিনিসে তৃপ্ত হতাম সর্বদা
বাতাবিলেবুর বলে করেছি জাহির
আমারও যোগ্যতা ছিলো।

কতোদিন দূরে
বাঁশের সাঁকোর থেকে নিচের পুকুরে

ধরেছি সন্ধ্যায়
আকর্ণবিস্তৃত মাছ—আজো মন চায়
তেমন যেতেও ছুটে আনন্দের পানে—
এখন সমস্ত যাত্রা দুঃখের সন্ধানে !

কুয়াশায় ঢেকে গেছে সারা পথ, পাহাড়ের চূড়া
পাইন-ধুপির থেকে জল পড়ে বৃষ্টির মতন
জোড়বাংলো থেকে আসে ট্রাক নিতে মাংস পাহাড়ের
হাটের ধুলো কি দূর কাঞ্চনজঙ্ঘায় লেগে আছে ?

ঈয়াকের দুধ থেকে লজেন্স সম্পূর্ণ হলে পরে
বড়োরাও চুষে থাকে—আমরা গিয়েছি আরো দূর
খেলাচ্ছলে দেখিয়েছি—'ঐ গাছে দাগ মারো দেখি—
বাহাদুর, তুমি কাটো ঐ গাছ—ও যেন আমার,
যৌনতায় সাড়া দেয় রূপসীর উরুর মতন !

আমরা ঘুরেছি কতো জঙ্গল-বসতি এই ভাবে
এই ভাবে করে গেছি পাইনের পৃথিবী সংহার
কেন, তা কি তুমি জানো ? তুমি এরই পূর্ব পরিচিত
তোমার আভাস আমি স্পষ্ট দেখি এইসব গাছে ।

ক্যান্টনমেণ্টের মাঠে দেখি ক্ষীর-পুতুলের নাচ
পালা নাই—শুধু চলে প্রতিদিন ব্যস্ত মহরৎ
'আমাদের যুদ্ধ চাই, পুতুলের জীবনে কী হবে ?
কিংবা ফিরে যেতে চাই শান্তির বিস্তীর্ণ পথে-ঘাটে ।'

আমারও কল্পনা তাই, আমি চাই বিনা যুদ্ধে পাবো
তোমাকে সহস্রবার কিংবা যুদ্ধ অজস্র হয়েছে
এখানে শান্তির মাঝে তোমার পশ্চিমা-প্রতিচ্ছায়া
পড়েছে পথেই তবু স্বাভাবিকভাবে কিছু বাঁকা—
আমিও সারল্য ভেঙে জিগ্‌জ্যাগ্‌ করেছি কৌশল
এবার তোমার সাথে স্তব্ধভাবে কোথাও দাঁড়াবো।

দারুণ দুপুরে চুল তুলে দেবে জানালার ধারে—
দুজনেরই ছুটি—তাই আসন্ধ্যা বসিব পাশাপাশি
ট্রেন ছেড়ে চলে যাবে রুমাল উড়িয়ে মধ্যদিনে
কলের যৌবন নাকি প্রাকৃতিক বেশি !

মা অা জাল পসরি রে বধেলি মায়া-হরিণী—

কোথায় রাখি তাকে
দুহাতে ঢাকি থাকে
হরিণী-মায়া মোর বনের নিরজনে
তখনি যদি পথে
পড়িত শাখা হতে
হুহুংকারে-ভরা ঘাতক দশজনে—
কোথায় রাখি তাকে
দুহাতে ঢাকি থাকে
হরিণী-মায়া মোর বনের নিরজনে।

আয়নায় পড়েছে আলো—ভিতরে করেছে পর্যটন
পল্লীর ঘুমন্ত লোক—তারই সাথে একান্ত আপন
বহুকাল-হতে-চেনা, সে দেখেছে চৈতন্যের গলি—
'কে আছে না আছে বুকে, বুক হতে দূর বনস্থলী !'

নিকটের তৃণভূমি—স্তেভয়-জাজিমে ওড়ে মথ্‌
সন্ধ্যা হয়ে আসে
তখনি ছুঁয়েছে বনপথ
সন্ধানী বাতাসে—
হয়তো সময় কাছে এলো !
হত্যায় চঞ্চল হলো ছুরি
সেগুন-অর্গানে বাজে বেলো
অমৃত্যু-মৃত্যুর লুকোচুরি—
তবু সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হয়ে আসে
তবু সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হয়ে আসে—

কাছে-দূরে শব্দ হয়—পা পড়ে পা পড়ে না এখানে
অবিরাম শব্দ হয়—অবিরাম কথা কাটাকাটি
হতে থাকে—বড়ো হয় ছোটো হয়, শব্দের পল্লীর
হাওয়া লেগে ভেঙে পড়া উইয়ের ঢিবির মতো মাটি
গুঁড়ো শব্দ—ফিসফাস আতঙ্ক-মাখানো মুখরতা
মুখরতা স্তব্ধ হলে—শোনা যায় মায়ার ক্রন্দন
মায়া-হরিণীর মায়া—পৃথিবীর প্রবৃত্তির মায়া—

স্তেভয় ঘাসের নিচে বলির মর্মর বেজে ওঠে
পূজার দালান—শাক্ত পাদপীঠ—জ্যোতির্ময়ী শাড়ি
গরদের গন্ধ, ঢাকে কাঠির জাজ্বল্য হিংসা-দ্বেষ
ঢাকা আছে—শোনা যায়—বহুদূর থেকে যায় শোনা
ধর্ম-মিউজিয়মে যত্নে রাখা আছে আত্ম-প্রবঞ্চনা—
তবুও হরিণী-হত্যা ! কে হত্যা করেছে আজই তাকে ?
অন্ধকূপে ফেলে নাকি ? উত্তাল বাতাসে ফেলে রেখে ?
অশ্রু ও রক্তের স্রোতে যুগপৎ গিয়েছিলো ভেসে

সে-মায়াহরিণী—আদি প্রেমের স্বপ্নের প্রবাসিনী—
আয়নায় পড়েছে আলো—ভিতর করেছে পর্যটন
পল্লীর সমস্ত লোক—তবু হত্যারহস্যের দিশা
মেলে নি, সমস্ত টর্চ একই সঙ্গে উঠেছিলো জ্বলে
তবু কোনো পদচ্ছাপ, অসাবধান হাতের পরশ
জেগে নেই কোনোখানে—হত্যার এ্যালিবি নেই কোথা
তৃণে কোনো দাগ নেই—স্বেভয় উজ্জ্বল হলো আরো
রহস্যে নবীনা !

অনন্ত নক্ষত্রবীথি—সমাধির দ্যোতনা তোমার বাহুতেও আছে
মেঘেও পায় না টের—নীলিমার গভীর আরাম
আমাদের কাছে
বোধ হয়—বোধের ওপারে
নিখিল তরণী ভেসে চলে একা মাঝিমাল্লাহীন
দিঙ্‌রেখা দুস্তর
অনন্ত নক্ষত্রবীথি—মধ্যে আছে তারই জন্মান্তর ॥

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য

'প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার'

খেলনা

পাবো না কখনো তারে আর, একবার পেয়েছিনু, যেন বাল্যে খুব দূরদেশে
গর্ভের সমান কাছে বারেবার আসা তার হয় না কখনো জানি তবু ডাকি-ডাকি
খেলনা খেলনা দাও ভাঙি ছুঁড়ে দিয়ে দেয়ালের অনেক উপরে।
কী নীল খোলে না দ্বার, হাতে যার অপেক্ষার বিশাল বিফল দুঃখ তার বুকে ভেসে
হে অপেক্ষা খেলনা দাও আর ভাঙি ভাঙি টুকরো করি জন্ম, কেন দিলে
কেবল মুণ্ডেরে।
বাল্যে যত যেতে চাই, কোথা যাবো। খেলাঘর খেলা সব অভিপ্রায়মালা
বলে, বোসো।
আমি তো ব'সেই ছিনু, দিন গেছে পেয়েছি বিবিধ, সখ্যতা, স্নেহার্দ্র খেলনা
আরো নানা প্রেম অপমান
রুচি, মিথ্যা, রুগ্নতারে ; স্বপ্ন তারে সব সম্ভাবনা···ভাঙি, ভাঙি, এই খেলা
এ-জীবনী পরানভ্রমর।
পাবো না কখনো তারে আর, একবার পেয়েছিনু শুধু চাই নিষ্ক্রিয় প্রয়াসে
চাই পেতে তারে এমনি খেলায়
গভীর অছন্দে এই প্রেম সব, স্পন্দন পরম, সব ; বাল্য, মনে হয় তুমি
কেড়ে নিলে খেলনা ম'রে যাবো।

প্রতিকৃতি

শুয়ো না কখনো দিনে মৃত ঝরা বাতিটার পাশে।
ও কার চোখের জল ও কার মুখের মতো ম্লান ;
প্রতিকূল হাওয়া এসে দাঁড়ালেই শুরু বালি খসা
খুঁজি সে সোনালি চুল চুল চুল তখনো আকাশে।

পাই না ; ঘুরায়ে তালু মুছে দেবো চোখের আভাস
হে বিষণ্ণ মর্মরের কৌটা যেন নীরবে সাজানো
দেবতা, সুদূর স্মৃতি ; প্রতিমা কি প্রচ্ছায়া তোমার।
পুরানো ধূলায় খুঁজি, ধূলা হ'তে পুরানো হৃদয়ে।

কখন ঢেকেছি মুখ আপনার দুঃখ মুছে নিতে
বেদনা, অপার কষ্ট ; এবং উজ্জ্বল বাতায়নে
প্রকৃতির সম্ভাবনা, স্থিতি, সুখ উত্তাল মৌসুমী···
আতিশয্য দেখে চোখ অকারণ গ'লে গেছে কিনা

জানি না ; সে-স্বপ্নে রাতে অবশ্য তন্দ্রায় গাঢ় প্রেম
তোমার মুখের 'পরে, বুকে, নাতিশীতল হৃদয়ে
আমারি চোখের অশ্রু, অকস্মাৎ স্খলিত বিন্যাস···
দুঃখের মুকুর তুমি অন্ধকারে আমার সান্ত্বনা।

জরাসন্ধ

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হ'লো পা। সেবন্নে শাকের শরীরমাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশ গন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমসলার পাত্র হ'লো, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র স'রে যাবে শীতল স'রে যাবে মৃত্যু স'রে যাবে।
তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

কারনেশন

প্রভেদ জটিল, অবগুণ্ঠিত সড়কে চাঁদের আলো
তাকে দিয়ো অই ফুলটি কারনেশন।
কতদিন তার মুখও দেখি নি, চেনা পদপাত পিছল অলক কালো
ও-ফুলের কথা বোলো না কাউকে বুড়ো মালঞ্চ।
মায়াবী সকাল ফিরে এনেছে কে, কে মঞ্জরীর অস্বচ্ছ আলোছায়ে
বাগানে ঘুরছে স্খলিত নিদ্রা, কেই-বা দুপুরে
ঘুমায় উষ্ণ বায়ুর বিলাসে ঝাঁঝাঁ গায়ে-গায়ে
ফুরোয় দুপুর ফুরোয় সন্ধ্যা শুধু জলরেখা শুধু জলরেখা।

২

হাওয়া খোলে মাটি নীহার অরব পুকুরে শব্দ!
সারারাত ম্লান মেছো বক ছিলো পুকুরের পাশে
আমার মতন আয়নায় দেখে মুখ আর মন
যার কথা ভাবে সে কিসের রেখা জলরেখা নয়।
হয়তো সড়ক জমাট অন্ধ, কেন আলো ফেলো
কেন আলো ফেলো অকারণ মৃদু চমকায় মন;
সাম্প্রতিকের যা দেবার আছে, নাও কেশে পরো
সে-কারনেশন শাদা আর লাল, সে-কারনেশন।

নিয়তি

বাগানে অদ্ভুত গন্ধ, এসো ফিরি আমরা দু-জনে।
হাতের শৃঙ্খল ভাঙো, পায়ে প'ড়ে কাঁপুক ভ্রমর
যা-কিছু ধূলার ভার, মানসিক ভাষায় পুরানো
তাকে রেখে ফিরে যাই দু-জন দু-পথে মনে-মনে।

বয়স অনেক হ'লো নিরবধি তোমার দুয়ার···
অনুকূল চন্দ্রালোক স্বপ্নে-স্বপ্নে নিয়ে যায় কোথা।
নাতি-উষ্ণ কামনার রশ্মি তব লাক্ষারসে আর
ভ'রো না, কুড়াও হাতে সামুদ্রিক আঁচলের সীমা।

সে-বেলা গেলেই ভালো যা ভোলাবে গাঢ় এলোচুলে
রূপসী মুখের ভাঁজে হায় নীল প্রবাসী কৌতুক ;
বিরতির হে মালঞ্চ, আপতিক সুখের নিরালা
বিষাদেরে কেন ঢাকো প্রয়াসে সুগন্ধি বনফুলে।

তারে দাও কোলে করি অনভিজ্ঞ প্রাসাদ আমার
বালকের মৃতদেহ, নিষ্পলক ব্যাধি, ভীত প্রেম।
তুমি ফেরো প্রাকৃতিক, আমি বসি কৃত্রিম জীবনে
শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ।

সাময়িকতা

ভেবে ছলাম তোমার বয়স হয় নি, ফুলের বয়স কেননা, আমি
তোমায় ফুটতে দেখি নি কোনোদিন মেঘ ফুটেছে, রোদ বৃষ্টি
এবং অন্যান্য ফুলগুলো তোমায় ফুটতে দেখি নি তখনো
বুঝেছি তোমার বয়স হয় নি
একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে মাঝারি শিরীষ গাছ একটা
অকারণে বিনা হাওয়ায় ভেঙে পড়লো পিঠের কাছে
মাথাটা সরিয়ে নিয়েছে পৃথিবী
বুঝলাম সবই অনেক দূর দিয়ে উড়ে-উড়ে আমার এক বন্ধু
চ'লে গেলো
চিনলে না ফুলওয়ালি তোমার কী একটি দুর্মূল্য ফুলই
ফুটেছিলো।

অন্তিম কৌতুক

কাঠগুলো শ্মশানে পুড়লে চিতা। কবে আমায় পোড়াবে
অমন রুপোলি স্রোতে। পুরুষেরা কখনো চণ্ডাল হয়।
ভালো। রাশ-রাশি মহিলা, আমায় চিতার
উপর বেঁধে তোমরা উল্লাস কোরো সমস্ত রাত।
জ্যোৎস্নার রেখাটি ছাখো দূরে অশ্রুবিন্দুর মতো কাঁপতে
লেগেছে। তোমরা আর কখনো জ্যোৎস্না দেখবে না জানো।

আমার বন্ধুরা সব ছায়াহীন হেঁটে অন্য দেশে চ'লে গেলো।

কে পশ্চাতে

জেগে উঠে বলেছিলাম বাতাসের কাছে যাবো না···না।
বাতাস অনেক কথা ব'লে দেয়।
পাহাড়ে যাই। পাহাড়ে যাই না। একবোঝা পুরোনো
কথা জেগে তৈরি। কাকে এড়াবে।
গলির বাড়িগুলো গলা বাড়িয়ে···নদী। বাচাল।
কেউ কথা বলতে পারে না এমন নেই। কোথায়।
কাল যখন শ্মশানযাত্রীদের বলেছিলাম তোমরা এগোও
আমি কী যেন ফেলে এসেছি, আনবো।
ওদের বুদ্ধিমান হাসি আমায় তাড়া করেছিলো।

চিত্রশিল্প অনন্তকাল

খুকু, আমি সাধ্যমতো ছবিগুলো এঁকেছিলাম···তুষার
জ্যোৎস্না, তাঁবুর পাশে ইতস্তত পোড়া কয়লা, কাঁটার লতা
আমরুলের পুঞ্জ-পুঞ্জ নীল অম্লতা সমস্তই এঁকেছিলাম···
বৃষ্টি জোঁক পুনর্জন্ম ম্লান আভাস কয়েকজন গরিব ভালোবাসায়
ছিন্ন পদ্মপাতা···
যে-গানগুলি তোমায় একা শুনিয়েছিলাম, প্রাচীনবয়স উভয়ত
আকস্মিক মুহূর্তের দেখা, ভিন্ন স্বরাট চাইবে জীর্ণ ছবি আঁকার
পুরোনো খাতাখানি। কেলাসিত আনন্দিত গান ;
সমস্ত কি ভুলেই গেলাম স্রোতাবর্তে প্রেমিক মুখচ্ছবি।

দক্ষিণ দিক্‌দেশ

বাতাস আমায় আবর্তে নিয়ে চললে সমস্তদিন, ব'লে একরোখা
তালগাছের মতন বাধা তৈরি···দু-আধখানা ভেঙে গেলাম
তেমন ক'রে পাহাড় ভাঙে না, পাড় ভাঙে না, কপালও
তোমার হাতে তো যাওয়াই স্থির ছিলো, তলে-তলে, নদীদেশের
সমস্ত অভিজ্ঞতায় বড়ো হ'য়ে বিস্তৃত হ'য়ে গভীরঘন স্রোতোধারার মতন
এই অল্প আগে একবার দাঁড়িয়েছিলাম, তার মানে সন্দেহ
তুমি তলিয়ে নেবে না নিশ্চিহ্ন
সন্দেহ ভেঙে ঘা দিলে যৌবনে, তৃতীয়বার মরা গেলো যা-হোক
বাতাস, তখন আমার শরীর ঢাকতে কী ব'য়ে আনবে।

পরস্ত্রী

যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো
যাবো না আর ঘরে
সব শেষের তারা মিলালো আকাশ খুঁজে তাকে পাবে না
ধ'রে-বেঁধে নিতেও পারো তবু সে-মন ঘরে যাবে না
বালক আজও বকুল কুড়ায় তুমি কপালে কী পরেছো
কখন যেন পরে।
সবার বয়স হয় আমার বালক-বয়স বাড়ে না কেন
চতুর্দিক সহজ শান্ত হৃদয় কেন স্রোতসফেন
মুখচ্ছবি সুশ্রী অমন কপাল জুড়ে কী পরেছো
অচেনা, কিছু চেনাও চিরতরে।

যৌবন থেকে বামে

যেখান থেকে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে আসি
পথের ধারে, পোড়ো জলার বুকের কাছে ভাসি
আমি শালুক অনভিজাত ; ঝিলের বাঁকা পথে
পঞ্চদশ কলসী চলে আমি সে-ফুল হ'তে
পারি নি, আহা নীলকমল লালকমল ভাই

এই যে-পথ শোলার খেত বাদামপাতা ঝরা
এই যে-পথ শিশুবেলার হাজারোবার ধরা
পানকৌড়ি খেলছে জলা দীঘল বাসি কাঁথা
প'ড়ে রইলো পচতে রইলো চ'লে গেলাম গাঁথা
মালা আনতে ধান ভানতে বনে

জলে ভীষণ শব্দ হ'লো। মারলো কেউ। জ্যোৎস্না নিরিবিলি।
চাঁদের মুখে ভয়াল চুল চাঁদের মতন কেউ কি একা ছিলি
ঘরে থেকেও ঘরের বাইরে। নেভা বাতির টুকরো ধরে জালে
তোর পুরোনো আত্মীয়েরা। দুঃখে মরি পোড়া ডাঙার ভালে।
হাওয়া, আমার কমলকুলায় ভালোবাসার শুকালো ফুলরাশি,
যেখান থেকে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে আসি।

শৈশব স্মৃতি

বর্ষার ভ্রু-লতা তুলতো, কনীনিকা দৃষ্টিপাতমালা
মুখখানি কে ভাসাও জলজ লতার মতো স্নিগ্ধ
পদতলে বিপর্যস্ত প্রেমাচ্ছন্ন দুঃখী গাছপালা
প্লাবন ভাসাও মুখ চারিদিকে সমুদ্র-সন্দিগ্ধ।

একজন প্রেমারূঢ় অন্যে পোড়ে কর্কশ রুচিতে
গরমে সুমিষ্ট ফল, বাকি সব পানীয়-কামার্ত
শূন্য, প্রৌঢ়, বিলম্বিত, উৎসবে যে-শোকের সংবিৎ
ব'য়ে আনে তার গান সম্মেলন, স্ফটিক, পরমার্থ।

দুর্গম…কে নিয়ে যায় নীলকান্ত জলস্রোতে…প্রেমে,
বর্ষার ভ্রু-লতা তার মুছে যায়, আভাসিত থাকে
পশ্চিমাছটায় ঘন কেশ যেন উন্মোচিত ঝর্না।

কে পশ্চাতে বেদনার গান গাও, নিন্দিত প্রৌঢ়তা
প্লাবন, ভাসিয়েছিলে বিহ্বল যৌবন কোনোদিন
কে স্মৃতি নীলাভ শ্যাওলা ডোবা বাড়ি দুঃখী মুখচ্ছবি মনে রাখে।

চতুরঙ্গে

খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য
নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার
কিছু-কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না।

এই অপরূপ পৃথিবী, সেদিকে যাবো না মিথ্যা
বাসনা যেমন চঞ্চল তার নিশানা জানি না
রমণী কখন প্রিয় করে হা রে হৃদয় জানে কি
তবু বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।

শুধু যা দৃশ্য, অন্তঃস্থল যে খোঁড়ে খুঁড়ুক
ভাসমান নদী ভাসাও নৌকা ভাসাও নৌকা
যৌবন যায়, চ'লে যাবো আমি ; চাষা বা ডুবুরি
খেতে সংসারে অক্ষয় বাঁচো দৃঢ় জলৌকা।
আহা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি ?
অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী, বাড়ায় শান্তি
প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইবো না আমি গাইতে চাই না।

জন্ম এবং পুরুষ

আবার কে মাথা তোলে ফুলে ফেঁপে একাকার চাঁদ
সাধ হয় মাথা তোলে ফাঁসা মাথা একাকার মাথা
গহ্বরে মাংসের বিড়ে মাড় মুত ফুল রক্তপাত
আগায় দুপাড় পিছে···স্তম্ভ লাল ছিলা লাল, লাথি
ভাঙে ঈশ্বরের মুখ, বোঁচা নাক, সহসা সিন্দুক
খুলে গেছে, দুমড়ে গেছে ; ক্লান্ত শাদা হা ঈশ্বর, ভেক
চিতিয়ে মরেছে রাশি, শাদা পেট উল্লুক চৌতাল
মরা উরু মরা মাছ কুঁচ সাপ কাঁকা নাল ডাঁটা
বুকের বনাত খাদ মুচিডাব দারুণ গরম
শক্ত লোহা শক্ত দুধ একাকার বিষাক্ত বলক
কে চুয়ালে মুখ নেবে। শয়তান ও অসম্ভব চূড়া
অচেনা সহসা, ফোলা, ফোলা সব ফোলা অন্ধকার।

যোনির মাঢ়ির খিল হাট করা, বেহায়া পাংশুতা
পুচ্ছ গোল নীল পুচ্ছ···হাহাকার কি মুখে তাকাও
ক্ষুরে ঘা নালি ঘা মুখে কোষ্ঠাকার মৌচাক ধুলায়
মাছিহীন পুরাতন, কে ছোঁয়ায় উরুদেশে প্রেম
দ্বিধা, খসে নাভি হৃদি আজীবন হে রম্য পুতলা
তোমার বন্ধনে রাত মৃতদিন উত্তেজনাহীন হে সমস্ত
কুরূপ ছোঁবে না পাপী বিমর্ষতা ঈশ্বরে ভজাও, নিশিদিন···
বড়ো জ্বালা জন্মের প্রখর জ্বালা ফোটালো বৃশ্চিক
প্রেতিনী মায়ের মুখ স'রে যায় বালুচরে তালুচরে জ্বলে।

বাহির থেকে

বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় ও-যে পায়ে পড়ছে এসে
এমন রাতে ঘুম ভাঙাতো স্বপ্নাতুর চোখ
ঘরের ভিতর হাওয়া খেলতো আলুল কালো কেশে
ফুটে উঠতো ফুলের বাগান, যেতে হ'তো না।

জানতাম না চূড়া পাঠায় হাওয়ার শান্ত সৈন্য
কেয়ার নিচে যদিও বাড়ে হাওয়ার ভারি ফণা
বুড়ো দেয়াল ঢেকে রাখছে যৌবনের হল্‌কা
বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় তোমায় চিনতে পারবে না।

বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় হাওয়া বাইরে থেকে আসছে।

দুঃখের আঁধার রাতে

চোখের নিচে ধ'রে রাখতে পাংশু মুখচ্ছবি
যেন নবীন আলো হয় না, দোলায় না মন চতুর্দিকে
এই পুরানো দরজা বন্ধ, ঘরও বন্ধ আনন্দ হে
পিছনে দ্যাখো সুখে ছিলাম কী উজ্জ্বল সে-মুখচ্ছবি

বুকের নিচে মৃদু দুলছে শোকার্ত দিন শোকার্ত রাত
পোড়োবাড়ির মতন নীরব শোনা যায় না শোনা যায় না
স্মৃতির সুখী ভ্রমর আহা বলছে কথা কানে-কানে
ভুলে যাও সে হারানো গান, চিরকাল কেউ দুঃখ পায় না।

শবযাত্রী সন্দিগ্ধ

মড়া পোড়াতে যাবো না বৈকুণ্ঠ আমরা কি মরবো না।
খোল ভেঙে দে বেতাল ঠেকায় চোখে টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া
কালরাতে যে-সাতপহর গাওনা হ'লো, তর্জা কাপ কবি
বিলেতবাতি ঝুললো, পোকা, লোকলশকর। কেউ ডেকেছে। কেন।
আমরা কেউ ম'রে গেলেই সঙ্গে যাবো তেমনটি করবো না।
সাধলে কবি সাতপহর মেলায় দিয়ে গান বাঁধবে নানা
আনন্দ কি বৈতরণীর অন্য পারে বিন্দু পাওয়া যাবে।

আলেখ্য

বাহিরে যত অন্ধকার ভালোবাসার দুর্গ ভেবেছিলাম
হৃদয় এ কী স্ফটিক ফ্যালো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত আলো
বাহুবিলীন প্রচ্ছায়া সে ছায়ার সতীন, গোপনে যাহা দিলাম…
লুটায় ফুল লুটায় মালা অবহেলার দলিত দান কালো

ভেবেছিলাম ভ্রান্ত নয় দুর্গরেখা কলঙ্কিনী কালো
মায়ার ছলে ভেবেছিলাম স্বভাবমতো সাজাবো ফুলমালে
তুমি আলোয় ভয় রেখে না, কেমন প্রেমে বাসতে পারে ভালো
কখন হ'লে বাহুবিলীন কখন ছায়া লুটালো তব ডালে

চিরদিনের স্ফটিক আমার যমজ, তোমার সন্নিহিত সখা
ফুল দিলাম নাই-বা নিলে অভিমানের চিহ্ন দিলাম নাও
পুনর্বার তুলেছি দ্যাখো আকাশলেখ তীক্ষ্ণ কনীনিকা
অনুচ্চ দান নাই-বা নিলে অহংকারের স্পর্শ নিয়ে যাও

ফোটে না কেন রামধনুর মঞ্জুলতা অনন্য এই মুখে
গরিষ্ঠ এক স্ফটিক জলে ভয় রেখো না, না-হয় নিলে দান
ভ্রান্ত বহির্দুর্গরেখা সামান্য ফুল দাও হে পরাঙ্মুখে
ক্ষণিক মৃদু দৃষ্টিপাতমালায় করি মুগ্ধতম স্নান।

ঝর্না

সারঙ্গ, যদি ঝর্না ফোটাই তুমি আসবে কি   তুমি আসবে কি
সন্তর্পণ পল্লব দোলে এত অজস্র বন্ধু হাওয়া
গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর অমন নূপুর জলে ভাসবে কি
পাহাড়খণ্ড   পাহাড়খণ্ড ওর নৃত্যের দোষ নিয়ো না হে।

অলস-অলস ভালোবাসা তুমি নদীপথ আঁকো নখে-নখে, তীরে
দাঁড়িয়ে পড়েছে শাদা গাছগুলি, উপঢৌকন সবুজ জড়োয়া
দেখছো না কেন ছুলছো না কেন তবু যে পুলিন জল মেশে ধীরে
কোথায় মেশে না ? পাহাড়খণ্ড ওর কোনোদিন দোষ নিয়ো না হে।

তৃষ্ণা জড়ায় পাকে-পাকে আহা সারঙ্গ এসো ঝর্নাপ্রান্তে
মাইল-মাইল ধূলাবালি ওড়ে অচ্ছায় যত গাছের পাহারা
মুছে যাবে তার নূপুরে, নৃত্যে, শুধু জল টানে পিপাসু ভ্রান্তে
ও ঝর্না ওগো ঝর্না তাহাকে ভালোবাসবে কি   ভালোবাসবে কি।

অকর্মণ্য

একটি ফুলে বাগান ভর্তি তাকে তুললাম বুকে
গাছেরা সব শিকড়ে চুলে পায়ে জড়ায় বাধা
অন্ধকারে ভয় পেয়েছি, মানিনী উন্মুখে
দিতে গেলাম অনন্য ফুল, বুকে জড়ায় বাধা।

অমন লতা দেখতে ভাবি আলো জ্বালাই, বাতি
দোলা দেখবো হাওয়ায় তার সবুজ পাল্লা নড়ে
কী উষ্ণ সে-জলের ঝর্না ভাসায় স্রোতের সাথী
আমার কোনো শোক ছিলো না তবুও পাতা ঝরে।

লতায় প্রচুর ভালোবাসাও অসভ্য নয়, বাঁচা
গভীর স্নেহে পুষেছিলাম আলোর ক্ষীণ মূষিক
পরস্পর প্রয়াসলগ্ন ? এ এক জটিল বাঁচা
স্বপ্নে নাও বনজ দয়া, জীবনে সেই মূষিক।

অতিজীবিত

বাগানের গাছটিও বাড়বে রোদ্দুরে বৃষ্টিতে
আমার ফুল ফুটবে তুমি সৌরভ পাবে না
পুকুর ভাসবে সবুজ পানায় নিরুৎসুক দৃষ্টিতে
মুখ আমার ভাসবে আলোয় গৌরব পাবে না

একা-একাই তোমার বোনা গাছটি দেখবো ফুলটি দেখবো
বাগানে কোনো বড় গভীর ছায়ার তলায় ঘুমিয়ে পড়বো
জল আসবে বৃষ্টি আসবে ভাসবে দেহ সে-ও আসবে
শশাকুচির আমবাগানে তোমার স্পর্শ রাখবে না।

নতুন হাত নিড়ুনি করবে এধার-ওধার দু-চারটি ঘাস
পুঁই তুলবে, মাচা বাঁধবে কুমড়োলতা মাখবে না
পুরানো নষ্ট শর্করায় নতুন কালো গাভীর পীযুষ
আমি মানবো সাপটে ধরবো নতুন বাগান, নতুন গাছটি
বেঁচে উঠবো সরস ঋজু রোদ্দুরে বৃষ্টিতে।

প্রত্যাবর্তিত

নিরস্ত্রের যুদ্ধে যাই   শস্ত্র হয় মন।
অন্ধকার পিতার চোখ, আকন্দের আঠা
চুঁইয়ে পড়ে মায়ের গালে, ধাতুর দর্পণ
আমাকে করো ঘাতক, বেঁধো তীক্ষ্ণধার কাঁটা
চক্ষে আর জিহ্বা কাটো অক্রূরের বাণে
আমাকে দাও হত্যা করি আমার সন্তানে।

মন আমার অস্ত্র হয় অন্ধকার বাধা
তার কঠিন হৃদয়ে মারি ঘুম ভাঙার ঘা
অঙ্গ আমার অবশ হ'লো কঠিন হ'লো কাঁদা
অন্ধকার বললো জেগে, এবার ফিরে যা।

অজগরের মাথায় জলে মণির মতো ভোর,
ক্লান্ত বীর এবার ফের ফেরার ঘরে তোর
মা হয়েছেন ফটিক জল, পিতা জোনাক পোকা,
ভিটের ভাঙা ধুলোয় কাঁদে ছাতার-পাখি একা

অন্ধকার তারার চোখ আকাশ পোড়া সরা
ভাগ্য কালো কাকের গা, ক্ষুধার অন্ন জরা।

বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে ?

আমার ভাবনা হ'লো বিশাল বাগান কেমন ক'রে মনে রাখবে
প্রতিটি গাছে পাখিরা আসছে, প্রতিটি দুঃখ
আলোর মান্য উষ্ণতায় মেওয়া ফলের মতন স্বাদু
ভাবনা হ'লো
গাছের-খাই-তলার-কুড়াই মানসিকতা
সুখের যত বিপল জড়ো কুড়িয়ে নিতে ঝুড়ি এনেছে।
বয়স হ'লো
আলোর আঁচে রাঙা ফলটি এবার দেখছি কোনোরূপেই নিকটবর্তী নয়।

ভ্রান্তি

জল যায় রে শিলা আমার বক্ষপট দহে
সালিতালতা রূপসী পোড়ে নিবিড় তরী ভ'রে
ফেরা ভালো ফেরাই ভালো, বাতাসে কত সহে
দহনভার ভস্মভার মরীচিভার মালা ?

রাখো কোথায় ?   ছন্নপট বিনা হৃদয় জুড়ে
হে শিলামালা চরণমূলে রাখিবে ধ'রে যদি
ফিরায়ো না সে শুভ্র হাঁস নখরাহতে ধীরে
নভোছায়ায় মগ্ন যেথা লুটায় রেখা-নদী ।

জল যায় রে এমন দিনে চাঁচর মুখপানে
তারাভিলাষী মাতাল শূক ফেনাবগাঢ় রাতে
পুড়িয়া মরে মান্দাসিনী ছুঁয়ো না মায়াভাণে
চরণমূলে চিহ্ন থাক শিলাবনত প'ড়ে ।

তোমায় কিছু দিয়েছিলাম প্রীতির ছায়াতলে
নীলাঞ্জন, ঝরিয়া গেলে রম্য চিতাপটে···
চমৎকার বারুণীগতি আছো তো সখা ভালো ?
বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূন্য নদীতটে ।

আমি অই যুবতীর উজ্জ্বল চোখের মতো একটি দিন পেয়েছিলাম
বাগানে গিয়েছিলাম নানা পূজার ফুল তুলতে
কুন্দ শিউলি সন্ধ্যামণি পাতায়-পাতায় ওরা কেবল বারণ রাখলো খুলে
আমি শুনলাম কেউ ডাকছে আড়াল রেখে কথা বলছে মৃদু
পায়ের তলায় ঘাস ফুটছে সেঁকুল কাঁটা ঝরাপাতার রাশি
কে গায়ের পাশে বসছে দাঁড়িয়ে পড়ছে আপন ছায়ার মতন
তার শীতলে ভিজছে সর্বশরীর।
নিবিড় হাতে ফেরালো কে বাগান থেকে ঘরে
নিত্যই ফুল তুলে ফিরি এমন হয় নি কোনো সময়
এমন হয় নি ফেরা
বাগানে তার সর্বশরীর ফুটে উঠলো মৃদু।

সম্মেলিত প্রতিদ্বন্দ্বী

ভালোবাসার তেমন আকাশ পাই না কেন ভালোবাসার তেমন আকাশ
চিরহরিৎ হৃদয় দুঃখ জুড়াতে যায় ভ্রান্ত দুঃখ জুড়াতে যায় পথে-পথে
নদীতে এক জটিল ধূসর বাষ্প লুটায় ধুলার ধারে-ধারে
আমার শান্ত পথ-চলায় এতই বিঘ্ন রেখেছো, ভালোবেসে।

আলো জলছে ক্রূর, এ তোর বিরহ হ'লো লম্বমান সূর্য
আকাশ শাদা ফণার মতন শুধু ঘুরছে করুণ অক্ষপথে
তেমন ভালোবাসার আকাশ কোথায় পাবো। ক্ষমতাভরে চাও
শুভ বাসনা আমি পেলাম, তুমি ওকে ঘোরাও অক্ষপথে।

সব অরণ্য উন্মোচিত লম্বমান ব্যর্থ আশা কতক্ষণ জ্বালিয়ে রাখতে পারবে
চিরজ্বালা, আকাশে দোলে শ্যামল অন্ধকার
লালসাময় তড়িৎ তুমি কিছু-কিছু অশ্রুবেদনার্ত
অগণ্য নক্ষত্র হয়ে ফুটে থাকবে আমার ব্যাপ্ত প্রেমে।

শোনো, শ্মশান ভালো লাগে না প্রতিদ্বন্দ্বী, ধুলার ধারে-ধারে
ও কি পিশাচ নদী তুলছে বাষ্পাকুল গলিত স্রোতাবর্ত
আমার অভিমানী বন্ধু ঘৃণ্য অবিশ্বাসে থামায় গান
অপ্রেমে যদি-বা যুগ্ম, তুমি অমন শরীরে ক্ষত দিয়ো না।

অনিবার্যতা

এমন করে ফুরিয়ে যায় সবার ভালোবাসার গান
ফুরিয়ে যায় ফোটা ফুলের কালো চুলের ঘন সুবাস
কোথায় যায় সোনালি ধান সবুজ জল সোনালি ধান
স্তরে-স্তরে বুড়া বালির দুঃখ বাজে, বুকের ঘাস
শুকিয়ে যায় কেউ গ্যাখে না, দেখেছিলাম
ঝড় দিয়েছে তারে আঘাত পুনর্বার দাঁড়াতে যায়
কোথায় স্থল। বায়বী মোহ ধরেছে এঁটে, আলো ফুরায়
ম্লান ব্যথার সজোনো ফুল নেবে তো ঠিক, দিতে এলাম।

আমার ভয় যায় না, যায় বিচ্ছুরিত আলো গহনে
পথের রেখা তীব্রতম, কেন যে ঘোরা কুহকে টানো
সাধের ফুল দিতে পেরেছি হৃদয়ও পারি, ভেবেছো মনে
সখা ঝড়ের সহায়ে দেবে লাঞ্ছনা আর অনবধান
এমন দিনে ফুরিয়ে যায় আমার ভালোবাসার গান।

সখা

ফুরালো দিন   ফুরালো বেলা
সকল অর্থে ভাঙলো মেলা
সমাচ্ছন্ন ত্রাসে
হৃদয় বলে দেখতে চাই না
ও অপরূপ স্ফটিক পান্না
কেন যে মিছে আসে।
ফুরালো দিন   ফুরালো বেলা
শান্ত মুখে ঝড়ের খেলা
অন্ধকারে লুপ্ত
আঁচল রইলো আকাশে লগ্ন
কোথা সে-মুখ প্রণয়-মগ্ন
শুনেছি সন্তপ্ত
কে তারে বেঁধো অন্ধকার
ছায়া ঝরাও   ছায়ার হার
উঠালে ওর বুকে
ফুরালো দিন   ফুরালো বেলা
সকল অর্থে ভাঙলো মেলা
পায় কে পরাঙ্মুখে।

মুকুর

মৃদঙ্গ বাজত দেখি নাচত চন্দন
কুলশীল জানা নাই রসাবিষ্ট যত
মেলার আলোক নৃত্যপটে মেলার আঁধার বন
হারালো বন হারালো আলো মৃদঙ্গ নাচত রে।

খসিল মৌচাক তারা উচ্ছ্রিত জোছনা রে
তুমি চন্দন ভোলালে ঘর জনমসুধার ধারা
ধরিল জোনাকে চন্দন ধরিল জোনাকে হে
অভ্রফুলে ভাসিল গান বিপথগান বাঁধনহারা।

প্রভু হে কেন শুকালো ফুল, মুড়ালো গাছ পীতল মালা
দরদী মুখে মলিন হাসি বুঝি নি ছল শিল্পকূট
প্রিয় আমার নিয়েছো সব, ভ্রান্ত কর, নীরব, লুলা
স্বপ্ন নাও স্মৃতিও নাও পদ্ম নাও অক্ষিপুটে।

মৃদঙ্গ বাজত না রে নাচত চন্দন
চলো চন্দন মেলায় যাবো শূন্যমেলা চিতল ভঙ্গ,
নীরবে থেকো হে তারা সখি আঁধারতম আঁধার বন
লুলা হাতের পাতকী নাচে তুমিই তো মৃদঙ্গ রে॥

নিমন্ত্রণ

কোথায় থেকে তোমার ডাক শুনতে পেয়ে এলাম গতকাল
আমায় কেন ডেকেছো তাই বললে হেসে-হেসে
এমন সময় আবার এলো তেমন বৃষ্টি মাঠে
ক্ষেতের পর ক্ষেত ফুরালো, খামার, জঙ্গাল।
এবার তোমার পিছনপানে আকাশ, আমি বৃষ্টি ফেলে যাবো।

তুমি যেমন তেমনটি আর কোথাও কিছু নেই
তুমি যেমন, অপার জ্যোৎস্না ঝরিয়ে যেতে পারো!
চারিদিকের ক্ষেত-খামার ঝর্না হ'য়ে যায়
তুমি যেমন তেমনই ঠিক, এই তো চ'লে যাই
আকাশ, তোমার আর্শিখানা পড়শি-কুটুম রাখলো নিজের হাতে।

আড়াল

তোমার রুগ্ন মুখের 'পরে ছড়িয়ে আলোছায়া
আমি কখনো চ'লে যাবো, ভুলেও ভাবি নি তা ;
তোমার ম্লান বুকের 'পরে ছড়িয়ে ছিলো ছায়া
আধেক-বেলা, এলানো চুল আমার হাতে পাতা।

কোথায় যাবো ? কোথায় গিয়ে বলবো এমন বনে
কারোর দেখা পেলাম নাকো নদীর পারে থাকে ;
তার যে-নাম, কী নাম, আহা ভাবছি মনে-মনে—
এমন সময় অতর্কিত ডাকলো কে আমাকে ?

আধেক যার সকালবেলা লুকায় খেলাঘরে,
আধেক-বেলা ছুটিয়া যায় বাগান-পারে বিল,
অনেক তার পড়শি ছিলো ভালোবাসার তরে
আমার সাথে ছিলো না তার চোখে দেখার মিল।

তুমি যেন প্রেম

হে আমার শেফালিতলার ফুল কেন
বালকের মতো ঝ'রে ব্যথায় কৌতুকে কেঁপে ওঠো,
নিয়ে যেতে চাও হেন রাজ্যে যেথা ফেরার দুয়ার
বন্ধ হ'য়ে গেছে আর চাঁদ দেয় নিঃসীম পাহারা।

হে আমার শেফালিতলার ফুল, হে রাঙা বালক চলো যাই—
চিরকাল ব'সে থাকি, শুয়ে থাকি তোমার ভিতরে,
চাঁদের পাহারা বন্ধ ক'রে দিক গ্রন্থ-শিল্প-নারী ;
হে ফুল শেফালিফুল, হে নির্বেদ, তুমি যেন প্রেম।

পাবো প্রেম কান পেতে রেখে

বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে ব'সে আছো দেবতা আমার।
শিকড়ে, বিহ্বল-প্রান্তে, কান পেতে আছি নিশিদিন
সম্ভ্রমের মূল কোথা এ-মাটির নিথর বিস্তারে ;
সেইখানে শুয়ে আছি মনে পড়ে, তার মনে পড়ে ?

যেখানে শুইয়ে গেলে ধীরে-ধীরে কত দূরে আজ !
স্মারক বাগানখানি গাছ হ'য়ে আমার ভিতরে
শুধু স্বপ্ন দীর্ঘকায়, তার ফুল-পাতা-ফল শাখা
তোমাদের খোঁড়া-বাসা শূন্য ক'রে পলাতক হ'লো।

আপনারে খুঁজি আর খুঁজি তারে সঞ্চারে আমার
পুরানো স্পর্শের মগ্ন কোথা আছো ? বুঝি ভুলে গেলে।
নীলিমা-ঔদাস্যে মনে পড়েনাকো গোষ্ঠের সংকেত ;
দেবতা, সুদূর বৃক্ষে, পাবো প্রেম কান পেতে রেখে।

পাখি

বৃষ্টি নেই হাওয়া নেই আপাতত পৃথিবী নীরব।
জানালায় শঙ্খমালা সমুদ্রের গ্রীবা
দেয়ালে বিরস নীল গলিত গন্ধের স্রোত, শব
ছুঁয়ে আছো চন্দ্রমল্লী, পৃথিবীর অমর বিধবা।

আর কেউ পাশে নেই, বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই ঘরে,
ভালোবাসা নেই তার, সমুদ্রগ্রীবার থেকে মালা ঝ'রে ঝ'রে
উজ্জল পাখিরা সব একদিন উড়ে গেলো পরে
বৃষ্টি এলো, হাওয়া এলো পৃথিবীর মূঢ় গৃহান্তরে।

প্রতিমূর্তি

যেখানেই যাই তুমি কেঁপে ওঠো, ভুলে যেতে পারি
তোমার স্মৃতির সার হয়তো, এ-কাঁপন ভুলবো না।
বস্তুত পাবো না ব'লে সে কি মিথ্যা সুষমা প্রাণের,
অন্ধকারে হাওয়া লেগে স্বপ্নে-দেখা ভাঙা রাজবাড়ি ?

অনেক গাছের বার্তা ভুলে গেছি সময়-সঞ্চারে,
অনেক নদার গন্ধ ম্লান হ'য়ে এসেছে নাসায়,
কারোর কণ্ঠার শ্বেত মিলে গেছে অন্যের নয়ানে,
কারো-বা মুমূর্ষু রূপ ঢেকে দেয় স্তব্ধ কেশভার।

যেখানেই যাই তুমি কেঁপে ওঠো ব্যর্থতা আমার।

অসংকোচ

মাঝখানে পথ নেই,শুধু সম্ভবত কিছুক্ষণ
ঝর্নার নির্মল জল ধুয়ে যায় উদ্গত স্তাবকে।
এ-কোন্ বিকালবেলা, মায়াবী এ-কোন্ সন্ধ্যাকাল ?
তুমিও পাথর থেকে স্ফটিকধারার মতো ঝুঁকে।

তুমি কে, তুমি কে নীল, অক্লেশ-ভরানো অনুপম,
স্মৃতির নিভাঁজ ঢেউ মুছে কিবা লুকানো প্রান্তরে
ঝর্নার মতন ক্রূর, পুণ্য কত নিষ্ঠুরতা জানে
এ-তীর তরণী-শূন্য, কেন পার হবো বনান্তরে ?

আমার দুরাশা, খুঁজে ভিতরে বাহিরে এই পথ
মিলেছিলো শুধু, আর ধূ-ধূ উদ্বেলার সারস
নিভৃত কবিতা, মৃত নিশ্চিত, উদ্বেগহীন শ্লেষ।
মাঝখানে ছিলো পথ প্রতিভার দুর্নিরীক্ষ্য ক্ষত।

তির্যক

কঙ্কির মাথায় একটি ঝিঁঝি বসে
বেলা যায়
তেরছা দূর তাজপুরের মাঠে

পুকুরে রক্তের সর পড়ে
গাভিন গরুর মতো কালো ছায়া ফলের বাগানে
ডালিমের ফুলগুলি ফুটে ওঠে তোমার কৃপায়
দিনাজপুরের থেকে তুমি এনেছিলে সঙ্গে ক'রে।

সব রাখা যায়, সব থাকে
শীতল কৌটোর মধ্যে পুরোনো চিঠির পাকে-পাকে
তোমার আদর-স্পর্শ।

কিন্তু
হরি যাকে রাখে
সে যেন রাত্রির পাখি
বাদলে ভেঙেছে দুটি ডানা
নড়বার শক্তি নেই, ভয়
রাত্রি ভেঙে গেলে ভোর যদি
ইস্টিশান-মাস্টারের মেয়ের মতন মনে হয়।

তুমি যেন ধর্ম

স্মরণে মেলে না সব, যা পেলে দেবতা যেতো ম'রে।
তার রক্তে মেখে হাত, আমি কোথা লুকাই দেবতা,
জানো সব, বোঝো সব, তবু কেন ঐশ্বর্যে গভীর
মনস্কামনার ফুল, বলে, হায় অ-ফোটা কোরক !

পরাগের বিষে কাঁপি হলুদ বিষণ্ণ করজালে ;
সুদীর্ঘ লোহার গন্ধ নেড়ে দেয় মগজের খড়,
হেমন্ত, যা-কিছু পেলে দীর্ঘ প্রেম, বুকে নিয়ে চলো—
মড়কে, সাহিত্যে, মদ-মস্করায়, অনভিনিবেশে।

চূর্ণ-চূর্ণ করি স্মৃতি, তুমি কেন ক্রুদ্ধ জানালায়
ছাদের কড়ির নিচে, মেজে ফুঁড়ে, কম্পনের মতো—
আমায় আদর করো, স্বপ্নে, রাতে— চৈতন্যে আমার
যেন তুমি ধর্ম, সেই শান্ত অতিক্রম তুমি যেন।

ফুল কি আমায়

আলস্যে এ কি ভাঙা-অভাঙায় মেলানো আমার।
স্পৃহায় ক্লান্ত মর্ত্যভূমির সীমানায় দেখি
রেখার আঁধার ধারাবাহিকতা চায় না আলোরে ;
ফুল কি আমায় অমোঘ মুঠায় ফিরে যেতে বলে ?

মনে হয় কোনো সমূহ হরিণ পিছোয় যেদিকে
আমরা যাবো না
আমরা শুধুই নাচতে থাকবো. পাহাড়-তলায়, ঝর্নার ধারে
চূড়ায়-চূড়ায়, বাঁকা ভুল-পথে নাচতে থাকবো আমরা শুধুই,

ফুল কি আমায় অমোঘ মুঠায় ফিরে যেতে বলে।

দেবদূত

যে-বৃক্ষ নির্মাণ করে সেই বীজ অনব্যবহিত কর হ'তে
তোমাতেই ফিরে যায়, গাঁথা বুকে বাগানের দাগ।
সেই বৃক্ষ তুমি, তব কণিকারে কেমন প্রভেদ
দেবে? বিস্ময়ের মাঝে দুই চিত্ত সমভগ্ন ভূমি।

একদা তুমিই বৃক্ষ, অনুপস্থিতি কি পল্লব,
শাখায় পাতায় ভরা বৃদ্ধি তার তোমার আভাস?
মনে হয় অদৃশ্যের কোনো শাখা ছুঁলো বনে মেঘ
কোনোটি নিষ্ক্রান্ত যেন আকাশের অতল নিরিখে।

বুঝি, ব্যাপ্ত তব জ্ঞান, মনে হয় জানো না কিছুই
আরো অন্তরঙ্গভাবে, কোনো পাতা মানুষের মতো
ভোলালো মুখোশে, রূপে, কাল্পনিক নৈরাজ্যে নিজেরে—
তারপরে মুখে মৃত্যু, বুকে পচে সন্নিধান-আশা।

সব, সব জানো তুমি, তোমায় অদেয় কিছু নেই;
আছো সঙ্গ হ'তে দূরে, কোথায় হে জননী-জনক
প্রেমের সর্বস্ব-ধন? বাঁধি মোর খড়-মূলে পাতা,
সাজাই তোমার বৃক্ষ, অনুপম মিলন-বিন্যাসে।

ভুলে থাকি শিল্পে, মোহে, নীচতায়, রুগ্ন জড়দেহী;
কোথা তুমি, কোথা তুমি, হে দেবতা যদি সখা তার?

অন্ধকার শালবন

কোথা ব'সে ছিলে ? যাবার সময় দেখেছি শুধুই
ঝরছে পাতার শিখর-গলানো কার রাঙা চুল।
অবসাদ আর নামে না আমার সন্ধে থেকে,
ছুটে কে তুলিলে শালবন, ঘনবন্ধন চারিধারে ?

ফিরেছি, তোমায় দেখবো, তোমায় দেখতে পাচ্ছি
হয়তো তোমায় ; স্ফটিক-জলের মতন বেঁকানো ;
কানের পাতার তল ব'য়ে ওড়ে চুলের গুচ্ছ,
তোমার আলোই তোমায় মধুর করেছিলো একা।

বন্ধু আমার, বাদামপাতার শিখরে লুপ্ত
সময়, হে মৃত ডুবো বিষণ্ণ ত্রস্ত মুখোশ
উড়ে চ'লে যাও, কে নেয় আমার সকল লিপ্সা
পশ্চিমদিকে ? কে গো তুমি ব'সে মুখর বিরহ ?

ব'সে আছো হায়, আত্মার মাঝে জড়ানো পশম,
টেনে নিয়ে গেলে দৃষ্টি, যেখানে মর্মতলে
কেউ জেগে নেই, যথা দিন তথা সন্ধে থেকে—
কেউ কি জাগালে শালবন, বাহুবন্ধন চারিধারে ?

এখনি মূর্ছিত হই মুখ ধ'রে

এখনি মূর্ছিত হবো মুখ ধরে, অবয়ব ধ'রে ;
আচ্ছন্ন চাঁদের পিঠ, সরে-সরে যেয়ো না নিয়ত।
কী নিয়ে একান্তে থাকি চেতনার বাতায়ন-পারে—
সে কি নিঃসরণে শূন্য মনে-মনে গোলাপের মরা ?

সুন্দর, সুন্দর ফুল, মিছে তবে ক্লান্তির অসীম
সমুদ্রে, মকরগর্ভে, যাবো বলে মেতেছি যৌবনে।
অপূর্ব সময় আজ, হাঁস ফেরে হিমালয় থেকে
চকিত, নীলিমা গলে ; রলরোল ঝরে পড়ে বুকে !

তরল মাৎসর্য তুমি, কবেকার সন্ধ্যার গরিমা,
মিছরি-কেলাস, অম্ল, খর্জুরের মজ্জার আফিম
গ্রীসের সোনালি ফল, অপ্সরার উদ্ভাসের বক—
পাখা মেলে ধরে তার, বর্ণে-বর্ণে ফিরে যায় দেশে।

যৌবন যৌবন, একা দীর্ঘদিন র'য়ে গেলে বুকে—
না তোমায় বাসি ভালো, না তোমার প্রতিকূলাচারী ?
অপূর্ব সময় ছিলো ; আজো ছিলো ! জানি না কোথায় ?
এবার মূর্ছিত হবো কোথা মুখ, তাৎক্ষণিক প্রেম।

আজো উত্তর জানালা

আজো উত্তর-জানালা আমার খোলা
আলস্যভরা ভঙ্গিতে আছি শুয়ে
গাছের শাখায়-প্রশাখায় বাঁধা দোলা
উতল বাল্যে যাবে কি আমায় ছুঁয়ে ?

কখনো কুড়াই ফুল, গাছে জল ঢালি
আছে কি আমাতে স্মরণীয়তার কিছু ?
বহু আলস্যে হৃদয় হয়েছে কালি
তবু প্রেত এক আমার নিয়েছে পিছু ।

ব্যবধান

আর ভাববো না বছর-বছর ধ'রে,
কেমন আছো হে নিশাপর্বত চূড়ায়
জানালায় ভাসে মালতী-ফোটানো বেলা
নীলমেঘবনে কালোমেঘ তাড়া করে।

গতবছরের পুরনো সাম্প্রতিক
মেখলার মতো রূপবন্ধনে বাঁধে
আমারই গলায় ছাড়া-হাত করে খেলা
মরা মুখ হয় চঞ্চল, নির্ভীক।

রাগের কথা

আগের কথা হয় নি তোমায় বলা
আগের কথা কিছুই ছিলো নাকি ?
এমন ছিলাম সকালবেলা থেকে
গভীর, মরা, ভাঙা-মেঘের মতো ?

রাগের কথা হয় নি তোমায় বলা
কেবল চেয়ে অমল মুখপানে
তিরস্কার নিভেছে মৃদুদীপ
কোথায় হায় চলছি, কেবা জানে।

নদীর মাঝে তোমার নৌকাটির
হয়তো মাঝি ঘুমায় কান পেতে
জানি না, কাল দু-জনে ছিলে জেগে
তোমার গালে ম্লান চুলের দাগ।

আমি কি আজও অনিশ্চিত খুশি
তোমার চোখে দেখেছি জাগ্রত
ভুল আমার হ'লো কি শেষবার
আগের কথা বলবো কার কাছে ?

দেবতার গ্রাস

এও জানি কাছে আছো, এত কাছে কে থাকে আবার
স্থখের চন্দনচৌকি বুকে রেখে বসেছো উপরে—
আমার দুঃখের ভগ্নী, একই বৃন্তে বধির মক্ষিকা,
বসন্ত পলাশে লাল বনে-বনে ফোরোনি কৌতুকে।

ফেরাও, মূছিত হই মুখ ধরে অবয়ব ধ'রে
বসন্ত গবাক্ষপথে ডুবে যাই দু-জন বনানী—
অলিন্দে-অলিন্দে ফুটে, নৃত্যে রুগ্ন ব্যথিত জানেলা
খুলে দিয়ে কথা বলি, কথা বলি সাম্রাজ্যে, হৃদয়ে।

এও জানি কাছে আছো, এত কাছে কে থাকে আবার
একান্ত নিজের মতো ; অমূলক এ-বাসনা আর
যাবে না আমার যেন ক্ষুধা প্রেম অখণ্ড চেতনা।

শুধু দীর্ঘ করো মুখ, ছুঁতে চাই ফেরো ততোধিক
নীলিমা-নিরিখে, ব্যাপ্তে ; বসে রবো পাদমূল ধ'রে
দেবতা আমার ; জন্ম ফুরালে সমাধিতলে যায়
দেবতা আমার, গ্রন্থ-স্মৃতি-শান্তি উন্মুখ-সন্ধান ।

জানি এত কাছে আছো বামনেত্র দ্যাখে না দক্ষিণ
অথবা গোচর ছায়া দেখিবে না প্রতিচ্ছায়াভার
তা-ব'লে কি নাই নাই, প্রেম, বৃক্ষ গ্রাস করো মোরে।

হেমন্তে

বোসো, জানলা খুলে রাখি, চামরের স্বস্তি এসো হাওয়া
লুটাও অতুলনীয়, কাঁপে জ্যোৎস্না গোলাপের বনে
বাতায়নে চোখ রেখে তুমি যেন বোসো না গোলাপ
রূপের অসুখ মাঝে বেদনার দুঃখের মাধুরী।

আমি বহুদিন হলো ব'সে আছি, হেমন্তের ব্যাধি
আমারে দিয়েছে মৃত পরাগের বিলীন সম্পদ,
ক্ষয়ের অমরাবতী, শুধু ঝরা, ব্যর্থ ধ্বনিপাত—
একান্ত মুখের স্বপ্ন, হায় চোখ প্রয়াসে নিরত
খুঁজে পাবে কোনোদিন ? নাকি ওই অন্বেষণে তব
মহিমা প্রকাণ্ড হবে ? দুর্বলতা নিশ্চিত জীবনে
শেখায় সম্মান যেন রহস্যেরে। যেন ভালোবাসা
আপন হারানো অংশ, গৌরব বা উজ্জ্বল সময়

অতীত, অপ্রাপ্য ; তাই তুমি প্রেম পূর্ণের রচনা
আত্মশিল্পে ; তুমি বোসো সম্ভ্রান্ত প্রতিভা পাশে নিয়ে
শিয়রে, চোখের কাছে, আরো নিচে, হাঁটুর ফেরানো
চাদর সরিয়ে, কাছে, দৈহিক দূরত্ব ঢেকে, কাছে—
শোও, জানলা খোলা থাক, বাতায়নে যেয়ো না গোলাপ
বড়ো সুখ বড়ো দুঃখ এই মিশ্র আলেখ্যর ছায়া।

পিঠের কাছে ছিলো

পিঠের কাছে ছিলো শ্যামল আসন
কবে তোমার করুণ অঙ্গুলি
তুলে ময়ূর অথবা রাজহাঁস
মমতা-ভরে দেখিত অপলক।

বুকে আমার, হৃদয়ে বেলাভূমি
তুমি কি মাথা তুলিবে জল থেকে ?
শ্যামলিমার মালিনী, হাতে কই
শিল্পভেদী কুরুশ-কাঁটাগুলি ?

নিবিড় ভালোবাসার দিনগুলো

নিবিড় ভালোবাসার দিনগুলো তোমার কাছে মেলে ধরতে
ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয় যাবো
পাহাড় তাকে ডাকছে তাকে নদীর মতন সাপ্‌টে ধরছে বুকে ।

অনেকদিন একই ছন্দে পায়ের মাপে বাড়ি ফিরছো
একই নৃত্যে ঘুরছো-থামছো পুরানো চেনা মেজের উপর
না-বন্যা না-জোয়ার খেলছে করুণ ক্লান্ত পুকুরটিতে, রোজ
তোমার মুখ ভাঙাগড়ায় দিন ভাঙছে দিন গড়ছে আমার ।

মশারির চাল হাওয়ায় দুলছে সমুদ্রের নবীন নিবিড় স্রোতে
কানা-লণ্ঠন মাথার উপর টলছে যেন গরঠিকানী পান্থ
চুনাপাহাড় জ্বলছে অমন তৃষ্ণা যেন বিষ
এ-মূল বনের হরিণ যাবো কোথায়, কেমন দিকে ?

হে নীলাকাশ গোপন ব্যাঘ্র, কোন্ মমতা মাখা
তোমার । চোখের নিচে কয়লাখনি জ্যোৎস্না লেগে হাওয়ায় এলোমেলো
তোমার মুখ ঘুমন্ত আর তুমি ভাসছো আমার কোলের কাছে
চতুর্দিক ঘরে ফিরছে প্রিয়তম যুবকটি ফিরছে না ।

ছায়ামারীচের বনে

হৃদয়ে আমার গন্ধের মৃদুভার,
তুমি নিয়ে চলো ছায়ামারীচের বনে
স্থির গাছ আর বিনীত আকাশ গাঢ়
সহিতে পারি না, হে সখি, অচল মনে।

হারা-মরু-নদী কী দুঃখ অনিবার
ভরসা ফলের পাত হৃদে বড়ো বাজে
গহন শোকের হাওয়া ঘেরে মরি-মরি
বরষা কখন ঘন মরীচিকা সাজে।

হে উট, গভীর ধমনী, আমারে নাও
যোজনান্তর কাঁটাগাছ দূরে-দূরে
আরো বহুধূরে কুয়োতলা কালো জল—
হে উট, গভীর উট নাচো ঘুরে-ঘুরে।

কী ধার উজল অবিরত টিলা পড়ে
টিলা নয় যেন বঁড়শি, টিয়ার দাঁত।
অচল আকাশ ছাড়ে না সঙ্গ, জড়ে
বাঁধা থাকে মৃত ভায়োলিন বাড়ে রাত।

ফুটো তাঁবু লাগে পাঁজরে, ফাঁদ্রা ডুলি,
বুড়ো বেদুইন খরমুজ খায় দেখে
বলি, বড়মিয়াঁ, যাবো সে কমলাপুলি
নিশানা কী তার ? চাঁদ ছিলো চাঁদে লেগে।

সেনেট ১৯৬০

তোমাদের শেষ নেই, যবে শুরু ফসলক্ষেতের
বুক ভ'রে গর্ত খোঁড়া, একপ্রান্ত মেলানো পল্লীতে।
মরাই, গুদোম কিংবা আট-চালা অতিপ্রাদেশিক ;
ইঁদুর, বিহগশ্রেষ্ঠ গান করো কাতারে, সিঁড়িতে।

হেম্লিনের বাঁশিঅলা, এ-সশব্দ কলকাতা আমার
সানাইয়ে সংগীতে যন্ত্রে ট্রিস্টানের নবম সিম্ফনি
কতদূর যাবে, এ-যে ঢের বড়ো সমুচ্চ বিহার
সেনেটের শতপ্রান্তে মেথি খোঁজে ইঁদুরের শ্রেণী।

তোমার সারা গা বড়ো ধুলো-মাখা, বড়ো কষ্টকর
তোমায় আলাদা করে দেখা স্তব্ধ অন্ধকার থেকে ;
অথচ তীরের চেয়ে স্বচ্ছগতি, চেতনা তোমার
আধুনিক, নিষ্ঠুরতা যত জানো, কেবা তত জানে ?

রাজবাড়ি দেখা যায়, রাজা ঐ সিংহের আড়ালে
রয়ে গেছে, বহমান, পারায় ধাতুতে স্তব্ধ-থাবা
সেনেটের, হে পাণ্ডিত্য, তুমি ক্ষিপ্র ইঁদুরের গালে
গ্রন্থের বদলে দিচ্ছো, দীর্ঘ শক্ত দুর্গের কাঠামো।

পাণ্ডিত্য এমনই, শুধু ব্রাহ্মণের উদ্বৃত্ত-উদ্বেল
বাংলাদেশের মতো, এত বড়ো, সুস্নিগ্ধ গড়ন।
আজ সূক্ষ্মতর তৃষ্ণা তুলে ফেলছে স্ট্রিম্লাইন্ড বাড়ি
কুপিয়ে বুকের মাটি সাধ্য করে সংযোগ স্থাপন।

তোমাদের শেষ নেই, তৎপর কর্নিক নিয়ে হাতে
সংস্কারপান্থ, হে বন্ধু, ভেঙে যাচ্ছো পুরোনো কলকাতা।
সেনেটের ষাট সাল বুকে তুলবে তুলসীধারা রাতে
সহসা ঝড়ের মাঝে আশ্রয়ার্থে দেখবো না তোমায়।

আজ বড়ো দুঃখ হলো হয়তো তুমি মনেও পড়বে না
সেনেট, মাথার 'পরে শুধু কিছু সংবাদ-কাগজ
উড়বে কিছুদিন, ভুলবো, সন্ধ্যা থেকে রাতের ঠিকানা
জপে ফিরবো নিজবাড়ি, চার বন্ধু ছিন্ন চতুর্দিকে।

চাকার বাতাসে ঝরাপাতা উড়ে যায়

চাকার বাতাসে ঝরাপাতা উড়ে যায়।
এই ভালো, এই যন্ত্রচালিত খেলা ;
প্রকৃতি নিশীথ অগোচর ঝরোকায়—
হাওয়া ঢেলে করো উড়ন্ত পচা ভেলা।

মাছ হয়ে খাবো ঠুক্‌রে কলার থোড়
ঈপ্সা বনাম সামর্থ্যে হবে লড়াই
অফিস যাবো কি বয়ে চোথাপত্তর
দিন সংগত, রাত কি আমার চাই ?

চাকার বাতাসে ঝরাপাতা উড়ে যায়
কতদূর ওড়ে ? অবলম্বিত মালা
সামান্য রেখে সবটুকু খেতে চায়
সাধ হয়েছিলো বাড়িয়ে দিয়েছি গলা।

কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস

কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস
শিল্পের দক্ষিণপার্শ্ব ভ'রে কালো নীরব তুহিন জমে যায়।
রুদ্ধ অভিমান করস্পর্শে যে মোছাতে পারে
সেই অনাবশ্যকতা আমায় একাগ্র রেখে
একদিকে চলে গেছে।

অতগুলি বাগানের তীব্র ফল, আমি একা
অস্ত্রের গৌরবহীন
পড়ে আছি।

তুমি আজো ভীত আজো রুগ্‌ণ হয়ে ওঠো।
চাদরের নিরুপম তপ্ত দুঃখে শিমুলের মতো
তোমায় আচ্ছন্ন রাখি, হে বিষণ্ণ মহত্ত্বরহিত মাতা
তোমাকেও।

অতিশয় প্রেম নানাদিকে যায় পথিকের।
মম স্তব্ধ লোভ, তবু গ্রীস যেন অমল মুকুট তুলে ধরে
অতগুলি বাগানের তীব্র ফল, আমি একা
অস্ত্রের গৌরবহীন
পড়ে আছি।

আঁচলের খুঁট ধরে গ্রাস করবো

আঁচলের খুঁট ধরে গ্রাস করবো ও ভয়াল দেহ
সমস্ত কাপড়-সুদ্ধ পিঠময় ছড়ানো সংক্রাম
চুলের।
কী করবে তুমি, অলস প্রস্থিত রৌদ্রসম
ক্ষেতের সীমায় প'ড়ে বালুকায় রেখে শান্ত মাথা ?
যে-হৃদয় খেতে চাই তারে কি পায় না এইরূপে
কেউ, কোনোদিন গিলে শক্তিমান রাক্ষসের মতো
অথবা ভূতের মতো স্পর্শে স্পর্শে বাষ্পীভূত ক'রে
কিছুতেই—
সে কি থাকে ভগবান তোমার ভিতর ?

ভুলে যাবো একদিন, এ-কথায় স্পর্ধা থাকে থাক।
ভুলে যেতে হয় যদি তোমাকেও, হে ডুবো শরীর
চাড়া দিয়ো বুকে, নখে-দাঁতে খুঁড়ে ফেলো পিঠভর
উদোম সড়ক, পারো চলে যেয়ো ক্রূর হাত ধ'রে।
কী তবু কামনা বাকি, আজো কেন তৃষ্ণা নাহি সরে—
কিছুতেই ;
সে কি থাকে ভগবান তোমার ভিতর ?

যদি ঝরে যাও কে নেবে তোমায় আর

যদি ঝরে যাও কে নেবে তোমায় আর ?
মৃত বালিকার কপালের কাছে ব'সে
আমার দুঃখ সঁপে দিই ঈশ্বরে
যদি-বা থাকেন, নির্বান্ধব কেউ।
তোমার ছিলো কি এমন অঙ্গীকার
ভ্রমরের মুখ মানিবে না অন্তরে !

অমন ভুরুর তল হে বালিকালতা
কে বিরহ জলে সাজিয়েছে চন্দন ?
মালাকর খুঁজে পায় না মুকুট তার
মালার মলিন সরল চূর্ণশোভা
কে যে সেই ফুল পাণ্ডুর মনোলোভা
রেখেছে দুঃখে, বুক-'পরে মুখ-'পরে।

যদি ম'রে যাও কে নেবে তোমায় আর
আমি ছাড়া এই নির্জন পরবাসে ?

সদর স্ট্রীট

যে-শিল্প ঐকিক নয়, তারে করো দান শূদ্রাণীরে
চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে, যদি কারো
সাধ্য থাকে ! গালো পিত্ত, গালো চোখ, বেটে করো কিমা,
কলকাতায় ভেসে ওঠে আঞ্চলিক ভুফীর নীলিমা।

তুমি পারো মেলে ধরতে খোলা-বুকে স্বেচ্ছাচারী ভাষা
ডায়ারির বিষণ্ণ পাতা জড়ো করে পোড়াতে আগুনে
তুমি নও, দীর্ণ শীতবিহ্বল সাঁওতাল কৃষ্ণ চাষা
অথবা গুরুর গুরু, সংহতির গভীরে চৌচির।

তুমি কবিগান বেঁধে দোরে-দোরে অমন ঘুরো না
মুকুন্দ দাসের মতো, এই উনবিংশ যাট সালে
হৃদয় আমিষদষ্ট, রক্ত নষ্ট, কুকুর কি কালে
সত্যবান ভারতীয় পথিকের হাঁটবে পিছু-পিছু ?

অগ্রাহ্য সান্ত্বনা, শুদ্ধ লোকায়তিকের উন্মোচনে—
কী পাবে ? সাঁতার দাও, দর্পণে, লাফিয়ে পড়ো জলে !

মিনতি মুখচ্ছবি

যাবার সময় বোলো কেমন ক রে
এমন হলো, পালিয়ে যেতে চাও ?
পেতেও পারো পথের পাশের নুড়ি
আমার কাছে ছিলো না মুখপুড়ি
ভালোবাসার কম্পমান ফুল।
তোমায় দেবো, বাগান ছ্যাখো ফাঁকা
তোমায় নিয়ে যাবো রোরোর ধার
তোমায় দেখে সবার অন্ধকার
মুছতে গেল সময়, আমার সময়।

ফিরে আবার আসবো না ককৃখনো
তোমার কাছে ভুলতে পরাজয়।
সবাই বলতো, ইচ্ছেমতন এসো
অমুক মাসে, বছরে দশবার !
তুমি আমায় বললে, এসো নাকো
জীবনভর কাজের ক্ষতি ক'রে।

টবের ফুলগুলোকে দাও

পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ করে, কার্নিশে ছড়ানো লাল জামা
এইবার তোলো, নয়তো ভিজে যাবে উচ্ছ্রিত পশলায়
ফুলের টবগুলোকে দাও সিঁড়ি থেকে ছাদে টেনে ফেলে
মাটিতে ছড়াতে দাও ইতস্তত ভ্রষ্ট ওর মূল ;
নয়তো কী দিয়ে বাঁধবে শিখারূপী ব্যক্তিত্বের ভার
সটান সবুজ, যার দাঁড়িয়ে থাকাই মনোগত
ইচ্ছা, তাই বলি, নয়তো অভিলাষও বলতে পারতাম।

মেঘ, পুঞ্জ ভেঙে চলে কাপড়ের মতো ভাসমান
জলে ফেললে। লাল জামা, নিশ্চিত উগরেছে সব রঙ
ডাঁই-করা খণ্ডবস্ত্রে। চরিত্রের খণ্ডতা তোমার
আলো লেগে ধাবমান তিনতলায়, উন্মুক্ত সদরে।
টবের ফুলগুলোকে দাও বৃষ্টি পেতে, শিকড় বসাতে
টবেরই ঝামায়, পোড়ামাটির জীবন-জোড়া পাত্রে
তৃষ্ণা, তাই বলি, নয়তো পিপাসাও বলতে পারতাম।

আমারও চেতনা চায়

সব শেষ, আমারও চেতনা চায় ডুবে যেতে—
মন্থর আত্মার মতো, অথবা কাঁথার মতো ছেঁড়া।
রোগের কাঁটা ও গাছে মূল-সুদ্ধ, চেয়ে, হাত পেতে
আমারও চেতনা চায় ডুবে যেতে, আরোগ্যের সেরা,
জলে।

কী রোগ তোমার ? তাই ফুলবাগান থেকে দূরে আছো ?
হাটের হাসির থেকে ক্রোশখানেক নিষ্ক্রান্ত প্রান্তরে।
কী রোগ তোমার ? ঐ পরিকীর্ণ বিস্তৃত বটগাছও
মুড়ে মগ্ন বারোটার সমক্ষয়ী একহারা গড়ন ?

সব শেষ ; আমারও চেতনা চায় নিভে যেতে—
চোখের দর্পের মতো, অথবা শোভার মতো স্মিত।
বিষের তরল লাক্ষা বুক জুড়ে, সহস্র পা পেতে,
হাঁ ক'রে, জালিয়ে জিভ, ছাই হ'য়ে দমকা ঝড়ে স্ফীত
আমারও চেতনা চায় উড়ে যেতে তোমার শান্তির
মুখশ্রী যেখানে ভালো।

অল্প হলেও জায়গা আছে

এইখানে, তার ছন্নছাড়া ব্যথাকাতর বুকের কাছে
অল্প হলেও জায়গা আছে
জমির তেমন দর বাড়েনি মফস্বলে

কারণ? শোনো এক পা হ'লে
কেউ ফেলে না সহস্র পা

তাই এখানে বুকের কাছে
অল্প হলেও জায়গা আছে
বসত জমির।

মনে পড়ে মাছি হয়ে ঘুরেছি তোমার

মনে পড়ে মাছি হয়ে ঘুরেছি তোমার
প্রত্যেকটি নষ্ট ফলে
হলুদ পচন
এসেছে আমার পিছে
তারও পিছে এসেছে হাঁ-খোলা
অনিবার্য ডাস্টবিন···

এইভাবে মানুষের মাঝে দাঁড়ায় প্রাচীর
সৌভাগ্যদেবতা শনি একচোখে নির্বাচন করে কপালে বসার স্থান
ডুবে যায় নীল সদাগরি
কোথাও-বা
কৃষ্ণচূড়া ঝরে পড়ে তপস্বিনী রমণীর কোলে···

মনে পড়ে
মাছি হয়ে ঘুরেছি তোমার
প্রত্যেকটি নষ্ট ফলে
হলুদ পচন এসেছে আমার পিছে
তারও পিছে এসেছে হাঁ-খোলা অনিবার্য ডাস্টবিন !

হাত রাখি কালের বেড়াতে

দিয়েছে ভুলিয়ে সব

টেনে মেঘ যেন ছেঁড়া কাঁথা

দেখিয়েছে স্পষ্ট ক'রে আমাকে আবার

বেচে খাবে

আমার হাড়ের দাম অল্প নয়, পর্যাপ্ত, পরম !

দিয়েছে ভুলিয়ে সব

হাসি অশ্রু বর্জন বিদ্বেষ

এখন অস্তিত্ব দোলে টানা বারান্দার এককোণে

শৈশবের পেণ্ডুলাম

অয়েলকাপড়ে গন্ধ, বিষ !

দিয়েছে ভুলিয়ে সব

যদি দেয়

পারি না এড়াতে

নবজাতকের মুষ্টি, হাত রাখি কালেরই বেড়াতে।

বদলে যায় বদলে যায়

বদ্‌লে যায় বদ্‌লে যায়— বদ্‌লে যেতে-যেতে
একটি ইঁদুর থম্‌কে দাঁড়ায় খড়বিচুলির ক্ষেতে
বলে, আমার স্বেচ্ছা সাধ্য সব নিয়ে এই কাঙাল
যাওয়ার মধ্যে ঝাঁট দিতে চাই বিশ্বভুবন জাঙাল
এবং তাকে জড়ো
করি চুড়োয় আকাশস্পর্শ ইচ্ছা এমনতরো।

বদ্‌লে যায় বদ্‌লে যায়— বদ্‌লে যেতে-যেতে
একটি মানুষ থম্‌কে দাঁড়ায় জীবনে হাত পেতে
দিনভিখারি বাউল বলে, ইচ্ছামতন পারি
বদলবন্ধ কাল কাটাতে…কিছু না রাজবাড়ি
এবং ভাঙা ঘরও
শুধু বাঁধন, বদ্‌লে যাওয়া মূর্তিতে রঙ করো।

উৎক্ষিপ্ত কররেখা

এই বেদনার কপট কাঁধে আগ্রীবা মুখ গুঁজে
আমি তখন, তোমার নাম আমার নাম মিলিয়ে দেবো
আমি তখন বুকে রাখবো ভীষণ গর্ত খুঁড়ে।

২

গোলাপ এমন ক'রে পথে পথে ঘুরো না প্রত্যহ

৩

…চোখে তাম্রনীবি
বার-বার খুলে যায়, কুয়াশা, ভয়াল লালরেখা
ফুলের বোঁটায় পাংশু মাতৃমুখ।

৪

…মনে পড়ে, বুকের ভিতর
যে-স্বপ্ন সমাধি হ'তে মাথা তোলে, আমি বাসনার
সব রস তারে দেবো ; মুখখানি মোছাবো পুরানো
আনো তারে চাই চাই, স্বপ্ন থেকে ক্ষুধার্ত হৃদয়ে।

৫

এ নয় এমন কুঞ্জ যেথা হতে ঝরে ধ্বনিহারা
কবিতা, মর্মরফল, শূন্যতার নীলিমার দ্যুতি।
এ নয় এমন পুঞ্জ করা লাখ-লাখ অলংকার,
এ নয় মঞ্জরী, ঝর্না, এ নিঃসঙ্গ ভয়ংকর ক্ষুধা।

৬

এখন আমার কোনো কাজ জানা নাই
যা লয়ে বসিব পশ্চিম বাগিচায়
পশমের বল গড়ায়ে ফিরিবে সেথা
তাড়া করিব না নিভন্ত রৌদ্রেরে।

৭

কে ডাকবে আমায় ডাকো, কে আমার শুষ্ক ইঁদারায়
শীতল আস্থার মতো বসে থাকবে সনাতন প্রেম ?

৮

ভীত প্রেম বুকে জড়ো, কোলাহল ওঠে নখ থেকে।

৯

পৃথিবী আবৃত করে শুয়ে সেই গর্হিত বালক
খোঁজে ও-ক্লীবের দেহে, অভ্যন্তরে, মহান শূন্যতা।

১০

কোন্ দেবতার শব এত শুভ্র তোমার কণ্ঠার মতো ?
বহুকাল দুটি ডিম অনিষ্পন্ন রয়েছে বাহুতে—
এই ভ্রষ্ট কবি ছাখে, উতল আপেল বাগানের চেয়ে বড়ো

১১

সার্থকতা নয়, যদি সফলতা তোমায় প্রতিষ্ঠ
করে লোকালয়ে, আমি চিরদিন কুক্কুরের গলা
জড়িয়ে, আঁধারে ব'সে পচা মাংস নিয়ে একদলা
ঝগড়া করবো, যুদ্ধ করবো প্রাণপণ।

১২

চিৎপুরের ট্রাম থেকে উড়ে যায় একঝাঁক হাঁস
গঙ্গায়, এ-ভোরবেলা কে পরাও উড়ে বামুনের
চন্দনমিলিতলিপি, মুখে কল্কা, আমি ধর্মদাস
খালি পা, উদোম গাত্র···

১৩

শনিবারের বিকেল, আমি তখন থেকে দেখে আসছি
একটি হাত একটি মাত্র বুকে আমার নানান পাত্র
তার মাঝেই ছেলেবেলায় একটিমাত্র রাঙা বাদামপাতা।
আর কিছুর মানে হয় না, তার কিছুর মানে হয় না শুধু
একখণ্ড আমার করে ধূ-ধূ, করে ধূ-ধূই অকারণে।

১৪

অনেক পথিক ভালোবাসে শুধু পথ ভুলে যাওয়া
চকিত পাদপশ্রেণী দেখে ভাবে দীর্ঘ ভগবান
ক্রমাগত ক্ষুররেখা বালুর জগৎ মুছে দেয়
আপন মুখের প্রান্তে শান্ত-চরণের ছায়া থাকে।

১৫

স্বপ্ন কি পায় না খোঁজ? এই আধা-আঁধারে হৃদয়
হাঁ করে কীটের মতো পড়ে আছে। স্বপ্ন কি এমনই?

১৬

স্বর্গের চেয়েও কাছে প্রান্তরের অনুপম ডানা
আমি যাবো। অন্তর্গত তার, বক্ষোগত
আলোর সোনার বল।
পূর্বটিরে কোনোদিন পাঠাবো না পশ্চিমচূড়ায়।

১৭

সহসা আগুনে পুড়েছে সাতটি মুখ
কোন্‌টি আমার বুঝতে পারি না দেখে।

১৮

লাগে ভালো মিছে উল্লোল চারিদিকে
কোথায় মুকুট? কোথা স্বর্গীয় জর?
পরিকল্পনা মূলে কি ছিলো না ফিকে
জ্যোৎস্নায় নেচে জ্যোৎস্নায় ফিরে যাওয়া?

১৯

ঈশ্বরের বুক থেকে কে দ্রাক্ষা মোচন করে রোজ
তীর্থংকর, সে কি আমি?

পাতাল থেকে ডাকছি

স্পর্ধার মৃত্যুই শ্রেয়, তুমি ভ্রান্ত পুণ্যের কৌতুকে
আমারে নিতেছো টানি, আলিঙ্গনবিহীন দুর্গম…
বামে বা দক্ষিণে আহা প্রেম দুঃস্থ পাংশু রসাতল
উপস্থ ব্যাধির পোকা, কৃমি, পুঁয, রক্তপাত বুকে
আমারে ভালোই বাসে।
—নরক ! নরক ! ওরা বলে তারে চীৎকৃত সমীহে
বরং দূরেই রয় ; রম্য লীঢ় সম্পতি-সম্বৃত
শুকনো সুখী সামাজিক ; অতিকায় দুঃস্বপ্নে বিলীন
উজ্জ্বল সুস্থের স্পর্ধা।
এই স্পর্ধা পুণ্যে নেবে ছেনে
এত বড়ো কারিগর। ডৌল ভেঙে রহস্যে নবীন
নিয়ে যাবে যেন নিশা প্রলোভে পাখিরে
কুলায়-উষ্ণতা থেকে দেশান্তরে বিরহে বিনাশে
অক্ষয় নিদ্রায়।
প্রিয়তম, রাখো আত্ম এনে
আমার পাতালে বুকে উপভোগ আরণ্যক মূলে
ভীষণ সৌন্দর্য, দ্যাখো পাপ আহা অত্যুজ্জ্বল পাপ
স্ফটিক হে আদিনাগ পলালমণ্ডিত কেশমালা
শ্বেততম উষ্ণ চর, হে স্ফীতি হে মহান প্রলয়
আসন্ন কোরক বিশ্বে এই-ই মাত্র ভাস্কর্য পাতাল।

অন্তর্পঞ্জী

বার-বার ওষ্ঠে লাগে স্বেদ
তারপর শাদা ফুলগুলি।
শেফালিতলায় শুধু অবিরল কিশোরীরা নৃত্য করেছিলো,
পুরুষেরা যায় নাই।
ওরা সেই বকুলের ছলে ভুল পথে গরবে গিয়েছে···
আমি যেন বার-বার
তাহাদের বসনের আয়োজন কুমারীসজ্জায় যেতে পেরেছি, সেহেতু
এখনো নৃত্যের স্বেদ ওষ্ঠে লাগে শাদা ফুলগুলি।
তোমার মানসে সেই হলুদ বোঁটার স্থান হারায় নি ভাবি।

তরণী এবং যাত্রী চলেছে

পদ্মের পাতাও আমি সইবো না বুকের উপর।
এ-ই, কি তোলপাড় চলছে, নদীর কনিষ্ঠে, দ্যাখো চেয়ে
ব'লে, হাতে টান মারে স্বর্ণলতা, দ্যুতিময় নারী।
আমরা কী বুকে নেবো। আমরা কি। বলো আমি…
তুমি তো নিয়েছো স্বর্ণ, গোক্ষুরের মতো হিংস্র যুবা,
সামান্য পদ্মেরা আছে, পদ্মপাতা, পদ্মজা মৌমাছি
এবং অজস্র তুচ্ছ প্রাকৃতিক স্নেহচিহ্ন লোভনীয় দেহে।
কি ঘাড় ফেরালে কেন। লোভনীয় নয়।
—অসভ্য বিচ্ছিরি, শোনো সেই পদ্মপাতা নিয়ে
ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে মনে;
হাসি আসে নদী দেখে, আহা যেন গরলের স্তূপ
ঘোলাচোখ, কানা, রুগ্ন, কিইবা নেয় নি বুকে? বিষ্ঠা
পোড়া কাঠখড়, অসমঞ্জ যতো কিছু; তবু পদ্ম…
এ কোনো সমস্যা নয়, স্বর্ণলতা শোনো,
আকাশে হাঁসের বাঁকা মালা ভেসে যায়
হাওয়ায় ভাঙো না তাকে, পারো।
পদ্মকে পেরেছে নদী, ছিন্ন; পারে আমাদের দেখি।
তুমি খুব কাছে এসো, মুখের উপর পদ্মকুঁড়ি…

স্থনিভৃত, স্থনিভৃতি

রক্তের ফোঁটার মতো শোলপানা পুকুরের বুকের ভিতরে
চোখের পাতার মতো নড়ে, খেলা করে সারাদিন,
রাতে দেখতে বড় ইচ্ছা হয়।
কিন্তু ভাবি তত বড়ো দূরদর্শী পরিচয়ে অসমর্থ বুঝি।

মেঘের মতন ঠাণ্ডা সাঁতারু দুজন শোল বড় দুঃখী বলে মনে হয়,
আমার পিতারও চেয়ে
(পলাতক প্রিয়জন শোক রেখে গেছে)
তোমার বুকের তলে যে রূপ রেখেছ, মাছ আমায় বোঝাও
অই শাদা, ঠিক শাদা নয় চিহ্ন চক্কোরে মায়ায় শান্ত
ঘনিষ্ঠ উরসে তুমি শত শত বীজে সেবা রেখেছো কেমন।
তোমার সংসার দেখা দিনে, রাতে অন্য কেউ আসে।
মা যে বলে গেল আসবে। আসে না, দেখেছো।
অনন্য বীজের রাশি নিয়ে ফিরছে হয়তো রাত্তিরে
বিষণ্ণ শোলের মতো,পাথ্‌না গিঁথে ফুরোয় সাঁতার।

সুখস্মৃতি

একজন প্রীতি করে অন্যজন দয়া
বাড়বে নদীর স্রোত মৃত্তিকার দিকে
আমি ফিরবো অন্ধকারে, তুমি জ্বালবে আলো
নিয়ত ঘুরবে না রূপ স্পষ্ট চতুর্দিকে।
আবর্ত নদীর আত্মা নিরাবর্ত হবে
বৃক্ষের চূড়ারা স্থির কখনো থাকবে না
আমি আন্তরিক চিহ্ন চাইবো ভেবেছিলাম
তুমি তার পূর্বে দেখি সীমান্তে পৌছাবে।
নদীর আত্মীয় খাদ, শ্মশানে শোকার্ত
তোমার স্বামী ও পুত্র অগ্নিশর্মা হলে
স্মৃতি জ্বলবে শান্ত টুকরো, কখনো ভাববো না
কিশোর মুখশ্রী কার ? আমারও দৈবাৎ পেতে পারতো !

অবিশ্বাস্য

চক্ষু যেন গাছের তলার ছায়া
বক্ষোদেশ স্রোতোপীড়িত ভাণ্ড
আকাশে কার ধনুক আঁকা আছে
আমার বাঞ্ছা শিরশ্চূড়ায় সাপ।
চুম্বিত হও বিষুবরেখার নিচে
অই ভূমিতল নিম্নতম গুল্ম
যুগ্মতা কি গভীর আন্দোলন
তোমায় দেব প্রিয়জনের কাছে।

তুমিও প্রিয় অল্পদিন নয়
মৃৎপদার্থ বুলোও মার্জনা
মুকুট মানস বাসনাহীন করো
কখন শান্ত শুধোবে, নেই প্রেম।

চিরবাঞ্ছা শিরশ্চূড়ায় সাপ
দৃশ্যে ভুবন চমৎকৃত হবে
ভয়ংকরী নাগক্রীড়া উচ্ছ্বসিত বায়ু
ভূতল সহস্রাক্ষ দেখবে অবিশ্বাস্য খেলা।

সতীদেহ

না অই গম্বুজ ভাঙো দর্পণের চেতানো গম্বুজ
ভাঙো চেরা চুড়ো ফাটা মহান অখণ্ড নাভিগ্রাম
ব্যাদনে দংশনে মারে ; কোপাও বাগানে বৃক্ষমূল
শাদা খুন্ন মাংসপেশী আলো থাক দারুণ অধরে।
চিৎ হয়ে প'ড়ো শোভা, সুষমার কাঁকাল-অনুজা
কে লভে পিঠের শান্তি ঘাড়ের উরুর বিমর্ষতা
চন্দ্রকীটে ছেয়ে কালো থাক নিচে তৈতল প্রণালী
পাদানি, প্রখর ত্বক, ফের কোপ্‌ আমরণ শাদা···

ভুলেছো, গর্হিত···খাঁড়া সে প্রচণ্ড পলাল পরশু
মৃতভাণে, উষ্ণাতীত শান্ত যোনিনালি থেকে ছিঁড়ে
অর্ধস্তূপ বামে, বাকি অর্ধ দিনু পুরুষ-কুক্কুরে
বসন্ত-লাঞ্ছিত বনে, রমণীয় উলঙ্গ কল্মায়।
সময়ে জন্মের পূজা পেয়েছি যা অনর্থ মরেছে
বাঞ্ছার চেতনে তার, ভয়ে দৃশ্য তৃপ্তিতে মদির
বিভ্রম, চুম্বেছি কত বালকের ধূলাময় মুখ
স্পর্ধার দুর্বল দ্বীপ···গাভীযোনি যবযোনি, খাড়ি

অবহেলে···ভালোবাসা তুমি মোরে, নিরত কোরকে
আত্মগত টানো, প্রাণ দর্পণে দর্পণ, বজ্রপাত
পোড়াকাঠ প'ড়ে রবো বামদিকে অরণ্যবিরোধী
রবো হৃদি কষ্টিথলে ধূসরতা দেবতা ধেয়ানে

বিশাল মূর্ছায়, এসো ধ্বংস, ধূলা প্রাসাদ আত্মার।
(হে স্ফীত প্রগত নভঃ চন্দ্রভাগা বৃক্ষ মৃৎ চিতা।)
পুনরপি জন্মো বিশ্ব, জন্মি আমি মৃতের অতীত
অকাম নিস্পৃহ, হায় রম্যযোনি তরল মুকুট

কেশের মাৎসর্যে গলে গভীর পাহাড় সর্পফণা
গন্ধের ভস্মের ভারে পচে কাম জন্ম নিরবধি।
গ্রাস করো হে ক্ষীরোদা অক্ষিহাঁস আঁধারে সরসী
কানে অরণ্যের স্ফীতি, পাদচারী বাতাস বিভ্রম
পাথর তরঙ্গে দোলে বাষ্পীভূত প্রাণস্থলী চুপ
কোথায় আছো রে সখা দাঈমাতা আলোর ঈশ্বরী।
ভালোবেসে ভুলে কারে রেখেছিনু খাঁড়ার আড়ালে
প্রাচীর বটের রেখা অদেখা ভবিষ্য-প্রিয়তমা
পরমা, কী তব নাম ? নিয়তি, গম্বুজ এসো ভাঙি
শেষ মনোহর তুমি, কাঁধে দেহ, হে অন্তিম প্রেম।

হে গান হে নৈঋত

লম্পটের গান শোনো স্খলিত বা ছিন্নভিন্ন গান।
কোথা থেকে নামো নদী, ধূর্জটির শিরাশ্রয় থেকে ?
বেশ্যার মতন শাদা উচ্ছ্বসিত ফোলা উরু বেঁকে
স্বস্তিকের শীর্ষে, ঐ নীল কৃপ, ঐ কি ধূর্জটি ?

লম্পটের গান শোনো, দূরান্বয়ী অসতর্ক হল্লা,
সরাই, মদের কুঞ্জ, এ-প্রপাত উৎকৃষ্ট বাহবা,
স্নান করো সারারাত, তোরণের শীর্ষবিন্দু জবা,
লেহন-চুম্বন-যুদ্ধে এসো, যারা গ্রীষ্মে পুড়েছিলে।

বাহবা ঝর্ণারে এত অন্ধকারে তোর দীর্ঘ ক্ষীর,
আমাদের সিক্ত গান আহ্লাদিত জিহ্বা চাটে কৃপ,
অমৃত বা পারা, গাদ, ফেনায়িত আরণ্যক রজঃ,
উন্মত্ত আগুন ঢেলে ভাসাও সমাজ-মূল দূরে।
স্রাব, স্রাব ঝরে জোরে, গায়ে দীর্ঘ ভূকম্পন কাঁটা,
ছিন্নভিন্ন গান থামে, অবশ্য উজ্জ্বল দিন উজ্জ্বল পৃথিবী।

স্বকৃত আলেখ্য

স্তূপাকার বাসি ফুল, পচা গন্ধে ফুলেছে বাগান
গোলাপ ঝরেছে তলে। স্নেহ বিনা নিঃসঙ্গ মূর্তির
কিইবা নিয়তি ছিলো ? আর্দ্রতা নামিলো চারিপাশে
জ্বালালো বুকের লক্ষ্মী, চোখ গেলো উদাস হাওয়ায়
একাই স্বজনহীন দীর্ঘপথ অন্ধকার করি।
ইতস্তত শ্বেতরোগ, শোথ হ'তে চুয়ায় অশ্লীল
দেহের বিহ্বল মুত, কত দূরে সুন্দরী আমার
পুচ্ছে উগ্র অলক্তক, টানো মোরে যৌন-ক্ষেত্রে, মূলে !
বর্ষায়, অস্ফুট মেঘে উন্মন অতসীফুল-তরু,
কতদিন লেগে রবে গৌরীর আভাস মুখে তার ?
কবিসভা ধরো বুকে নূপুরের ক্ষিপ্ত পদপাত—
প্রকৃতি, মৌসুম-রসে ক্লেদ নড়ে কপাল অবধি।
আমি তোমাদের নই, ভ্রান্ত অবয়ব তবু যাহা
বলেছে সুন্দরতম, আজ দেখি খসে গেছে ছাঁদ
এতো স্নেহ, এতো প্রেম, এতো অহংকারহীন তমো
এতো অকারণ নীলে ডুবে গেছে পিচ্ছিল ধমনী

দুঃখকণা প্রাণকণা ঝ'রে গেছে হরিণের 'পরে,
রূপের আলস্য মম সেকি ঝরে হরিণীর বুকে ?
স্তনের কৃশতা হয় বনানীর মতন উজ্জ্বল
নিরম্ন গুমোট রসে ভেদ-বমি ব্যর্থ সঞ্জীবনে।
তুমি তারে করো পান গন্ধ সিক্ত বিস্তৃত মাথায়
কেশের উজ্জ্বল ভার ; তারপর কুক্কুটের মতো
সংকীর্ণ উলঙ্গ ঘাড় পান করো, সতৃষ্ণ নয়নে
চেয়ে দ্যাখো যৌনক্ষেত্রে শুয়ে আছে অতিথি তদ্‌গত।

নয়ানে উন্মুক্ত বুদ্ধ, বুকে লগ্ন অত্যাচারী যীশু
নাভির অমর পিণ্ড দাঁতে চেপে উদাস বোদ্‌লেয়র

র‍্যাবোর উৎক্ষিপ্ত অণ্ড গ্রাস করে কলঙ্কী ভেরলেইন
ললাটে অসীম বৃদ্ধ, তৃণের মূলের মতো জয়ী
এ-জ্যোতির্লেখা তুমি দেখিলে না, তব অনুরাগ
আপনার বৃক্ষ-রোম-স্বেদকণা নিয়ে করে খেলা
নারীরে করিবে পান, জিহ্বায় লাঞ্ছিত রবে ক্ষুধা
আমারেও লবে যবে দিয়ো ত্রস্ত একটি চুম্বন।

দ্বিধাহীন

একী জালা হলো প্রভু স্পষ্ট করো তীক্ষ্ণ সূর্যতারা
সামান্য স্তনের উষ্ণে তৃপ্তি পাবে অদ্ভুত বৃদ্ধেরা,
আমরা তো বৃদ্ধ নই, তুচ্ছ দান বিক্ষুব্ধ সাগরে ?
প্রতি দাঁতে কুমারীর অজস্র অধর দিতে হবে।

যদিও কুমারী ক্লীব সভাটিকে স্থিরভাবে জানি,
নারীর উদর, নীল জলস্তম্ভে তৃপ্তি পাবে শিশু
কেননা, সে সুশিক্ষিত অই তার প্রথম আশ্রয় ;
আমি তো ছিলাম ভদ্র বাল্যকালে, নিষ্ঠ, অন্ধ, জ্ঞানী।

উদ্ধত আকাশ চিনি, তোমার নির্লিপ্ত অন্তঃপুর
বুঝতে চাই, কোন্ শান্তি স্ফটিকের মতো একা রাখো ?
মনে হয়, এই-ই শান্তি...সহবাস-সন্ততি-সংসার
শান্ত গাছপালা, পুণ্য, বন্ধুপত্নী, আত্মীয় প্রচুর।

কোথায় তোমার অর্থ, নারী কি ?   আনন্দ ?
উদ্দাম শৃঙ্গারযুদ্ধে গণিকারা অনুজ্জ্বল মৃত।
কোথায় সদর্থ মিলবে এই রাহু, এই উত্তেজনা—
তলায় মনসার কাঁটা, উপরে উন্নত কোঠা বন্ধ।

তবু তীক্ষ্ণ করো আলো চারপাশে বৃদ্ধদের দেখি,
প্রকৃতি প্রপিতামহী, পণ্ডিত মানুষ-ন্যায়রত্ন
কেমন জীবিত থাকে সামাজিক শ্মশানের মতো
নাবালক সদ্বিধি, শিষ্টমূল্য, অজস্র জোনাকি !

প্রচণ্ড পাতক নই, দ্রব্যগুণে ক্রিয়া হয়েছিলো
বাল্য থেকে যুবকালে কর্মঠ সারস।
রমণী-সমস্যা নয়, অর্থকষ্ট অবন্ধুত্ব তোমাদের হোক্
অনর্থ-সম্বন্ধে আজ সর্বনাশ কে মাথায় জ্বালো ?

মৃত্যু একটি কূটনীতি, ঠাণ্ডা, শূন্য আগ্নেয় তোরণ।
আমি শেষ সভাসদ যুবকটি কখনো ফিরবো না
বাধ্য ক্রীতদাসসম, পৃথিবীতে স্পন্দ্যমান স্রোত
সমস্ত বৃদ্ধতা নিয়ে ভোগবতী পুষ্ট অভিজ্ঞানে।

ইয়ার্কির সীমা আছে প্রভু, কোন্ অর্থে আমি যাবো ?
তুমি যদি বাঞ্ছা করো আমি হয় মৃত বা জীবিত,
সামান্য বিক্ষোভ হবে, সমুদ্র যে আগ্নেয়-প্রদেশ।
আমি দ্বন্দ্বে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ভাবছো কলঙ্কে পৌছাবো ?

বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে

১

শান্ত শোভাময় হাত, নীলিমার সম্পূর্ণ দেহের মতো।
পুণ্য ধূপ থেকে লাগে মন্দিরের সর্বত্র আগুন
দেবতাও পুড়ে যায়।
এক শোভাময় হাত সকল আঙুল ফেলে চারিধারে
ডাকে···
নিরুক্ত নিষ্কাম মর্মে যতোদিন ছায়া ছিলো বাগানের
ততোদিন
দারুণ প্রাণের মাঝে আসা-যাওয়া করতো বালিকা
যে-ছলে দাঁড়াতো এসে আজ তার কিছু মনে আছে
বাকি স্তব্ধ হয়ে গেছে একমাত্র শোভাময় হাতে
নীলিমার সম্পূর্ণ দেহের মতো।

২

পরাজয়, পদ্মের উপর থেকে অতোগুলি পরিস্ফুট মূল
আমার বুকের কাছে
কেবল পাথর থেকে ক্ষীণ লুপ্ত সময়ের সরোবর তোলে কোলাহল
কানে
এখনও জানে না কেউ
নীরব হাঁসের সার নেমে আসে মস্তিষ্ক ব্যাপিয়া—
কতদিন কবিতার আচ্ছন্ন শরতে দিন যাবে ?
পরাজয়,পদ্মের উপর থেকে অতোগুলি পরিস্ফুট মূল
আমারই বুকের কাছে।

৩

আবার তোমায় ভাঙবো, নীল নারিকেল গাছ হৃদয়ের।
আবার তোমায় দেবো রেণুবদ্ধ প্রাচীরেরমতোদেহের সীমার বাসস্থান,
সব পরিবেদনার মালা যেন গাঁথা হয় দূরে
আমারে ছোঁয় না কেউ

বহু মানুষের শান্তি ছেনে, এই গভীর রশ্মির জাল
সর্বাত্মক তীব্র কবরের মতো, এইখানে।

৪

অস্ফুট স্বপ্নের স্রোত, তারো মাঝে হানে ডালপালা দুর্বল বাতাস।
পাখিদের বাসস্থান ঝ'রে যায় চাঁদের ক্লান্তির মতো
অমর শুধুই কবি, মেধা থেকে মুক্ত করে রস
গোড়ালি, হলুদ রোগে উন্মোচিত দুই পাত্র ভরে
অকুণ্ঠ জোনাকি।
দেবতা হয় না ক্রূর। আমি নই চরণ-শঙ্কিত মর্ত
অমর আমার কবি মেধা থেকে মুক্ত করে রস
রোগা ভিখারির মতো।

৫

পাই না শুধুই হাতে অমূল ফুলের স্তম্ভ,
জানি তোমাকেই তরুপ্রায়।
দিগন্তের জানেলায় অন্ধমূর্তি কিশোর একাকী
তোমাকেও।
স্তনের শাঁসের মতো অন্তঃপল্লী তোমার প্রাণের সংবেদনা
চিত্তের ঐকিক গ্রন্থি ছিঁড়ে দেয়, আমার পল্লব···
শ্বেত অজধারা এসে অমল ক্ষুরের চিহ্নে ভরে দেয়
আকাশের শাখা।
পাই না শুধুই ফুল, মূল, ক্ষত, সত্যের বেদনা ভালোবেসে!

৬

কপালের আয়তন ভাঙা ডালিমের মতো
কাঁচা মাটি তারপর।
ন-লক্ষ শেফালি তীক্ষ্ণ বিপ্লব ভাঙিয়া রাখে দেহে
আমাদের তমোচ্ছবি পরিপূর্ণ বিশ্বহারা উল্কাপাত যেন
তারপর
রশ্মি-তাপ করতলে স্বগত গিরির শান্ত সমীহের মতো
অখণ্ড গম্বুজ

উরসের আয়তন কোনোদিন শরতের দ্বিধা—
কাঁচা মাটি তারপর।

৭

আসন্ন রাতের মাঝে তোমায় পাবো না আর
পিপাসামথিত জিহ্বা তীব্র বাদামের মতো
সহসা ছেলের হাতে
দিয়ে যাই।
নরম সোনালি চুল দোলা খায় সকল ভুবন জুড়ে।
বারিপাত অশ্রুবৃষ্টিসম
কোনো-কোনো বিলের মাঝেও মিশে যায়।
অনন্ত তবুও চুপ।

৮

পরিণত স্ফূর্তি কামনায় হ'তে পারে।
দূরত্ব মানি না আমি।
মেঘ ফেটে ইতস্তত মূল বেরিয়ে পড়েছে বুকে
মাঠের জলন্ত সাপ বহুকাল তারার মুখের দিকে চেয়ে
এও জানি
দেবতার নীরব হাতের সীমা-লঙ্ঘনের পাপ ছিলো তোর।

৯

পরিচ্ছন্ন চেতনাই সব শৃঙ্খলের একীভূত নিঃশব্দ বিপ্লব।
চরম নিরুদ্ধ বাষ্প তোমাদের মাংসে-মাংসে
সতত-সঞ্চরমান বল
খেলা-হারা, বেগলুপ্ত সে আমার-ও।
হয়তো নিষ্পন্ন প্রেম বড়ো সেই ফলে
দ্যুতির মুক্তিও যেন হঠকারী শাখা,
তবু পৃথিবীই সব
আনন্দজনক ভয় মুহুর্মুহু নিষ্পত্র বাগানে
বসন্ত দুয়োর দাও।

১০

শীতের সমূহ পাখি ক্ষিপ্ত লাফ
দিয়েছে তোমারই অমল যোনির পানে।
একটি স্বর্ণপাত পুড়ে উত্তরোত্তর ঘন ধোঁয়া
ঠাঁমহীন নিঃস্ব স্বর্গচূড়ে যায়
নীলিম বরফে বদ্ধ অনাদিকালের সাইবেরিয়া—
পায়ের উপর থেকে ক্রমে শাল উড্ডীন মরালসম।
তোমার উজ্জ্বল উরু দেখে মনে হয়
মরে যাবো।

১১

শীর্ণ হাতগুলি ভালো
শীর্ণতম কটি
পেথমের মতো নিদ্রালস।
গুরুতর মেঘ রাজপুতানার ঘাগরাভরা নাচ
পল্লবিত করে যায়
মাটিও ঘাসের পিছু জাগে
ময়ূর সঁপিয়া দেয় জোনাকির মাল্যে নীল গলা।

১২

শ্রান্ত সাংঘাতক দৃষ্টি।
প্রতিরুদ্ধ সুন্দর সোপান
অনব্যবহিত পীঠ অথবা দুয়ার কিছু নেই
সহসা নীরব মাঠ, তারোপরে
আবদ্ধ নিহত করতলে সূর্যদেব।

———

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

কাব্যসংগ্রহ